জন্মান্তর

বীরেন্দ্র মল্লিক

অগ্রণী বুক ক্লাব
কলিকাতা—৬

প্রকাশক

বীরেন্দ্র মল্লিক

৪৬, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদপট

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

কভার ব্লক ও মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৭

মুদ্রাকর

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ম্যাগনেট প্রেস

৩৫, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

দ্বিতীয় কলেবরে 'মন্বন্তরের ইতিহাস' নবজন্ম লাভ করলো। আরো চারিটি গল্পের ('বেল্ বাজে,' 'বাঁকিপুরে সুবোধ,' 'মিনতিদি' ও 'তদন্তে') সংযোগ হলো এতে। পুরানো গল্পগুলিতেও স্থানে স্থানে ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন দেখে তা করেছি। কোথাও নতুন করে লিখতে হয়েছে।

'জন্মান্তর' বৈ কি! তাই নামান্তরও করলাম।

মুদ্রণ বিষয়ে ও প্রুফ দেখায় যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁদের স্মরণ করি।

ব্যক্তিগত দিক থেকে লেখায় আমাকে শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর সাহায্য করেছে।

৪৬, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট — বীরেন্দ্র মল্লিক

কলিকাতা—৭

১লা আষাঢ়, ১৩৫৭ সাল

মন্বন্তরের ইতিহাস

একটি হুক্কু কিনিয়া আনিলেন রায়বাহাদুর নটবরচন্দ্র দাস সেল হইতে। হুক্কু একপ্রকার কালো বাঁদর। লেজটি খুব লম্বা। প্রকাণ্ড ঐ লেজ দিয়া সে গাছে ঝুলিতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রায়-বাহাদুর একটি মস্ত খাঁচা উহার জন্য কিনিয়া আনিলেন। গাছের ডালে তাহার সর্বাংগ ছাইয়া আছে। বাড়ির মাঠে পিঞ্জরটি রাখিয়া রাতদিন রায়বাহাদুর বসিয়া থাকেন বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ার লইয়া। হুক্কুর দিকে চাহিয়া তাঁহার মোসাহেববৃন্দ নানা-প্রকার মন্তব্য করে। তিনি আনন্দে উল্লাসে গদগদ হইয়া ওঠেন। মনে মনে এক অতুলনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। যেন এমন এক অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় বস্তু তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার জোড়া নাই।

হুক্কুটি সমস্ত দিন ধরিয়া এ-ডাল সে-ডাল করিয়া নাচিতে নাচিতে দুলিতে দুলিতে মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে সবার উঁচু ডালে উঠিয়া গিয়া লেজের সাহায্যে নিচু দিকে মাথা করিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে 'হুকু হুকু হুকু' করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। কখনও বা ঘুরিতে ঘুরিতে এক লাফে একেবারে রায়বাহাদুরের কাছে আসিয়া

হাজির হয়। সদাসর্বদা তিনি কাছে দানা রাখেন। হুক্কুটি কাছে আসিলেই হাতে করিয়া দানা খাইতে দেন তাহাকে। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে রায়বাহাদুর বারান্দায় ইজিচেয়ারে আসিয়া বসিলেই হুক্কুটি তাঁহার কাছে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া হাজির হয়।

রায়বাহাদুর গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া হাসিয়া বলেন ;—"বড়ো দুষ্টু হয়েছে এটা। একটু যদি ছাড়ে।"

হুক্কুটি কিন্তু সত্যই ছাড়ে না। সম্মুখ হইতে ক্রমশ ইজিচেয়ারের হাতলে ও শেষে রায়বাহাদুরের হাতে গিয়া বসিতে শুরু করিল। রায়বাহাদুরের কোনো প্রকার গ্লানি কি ঘৃণা অনুভব হইত না। বরং তিনি তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেন ;—"তোকে নিয়ে আমার এক ভাবনা হলো দেখছি !"

সত্য ভাবনাই হইল। তবে হুক্কুকে লইয়া নয় রায়বাহাদুরকে লইয়া। রাত নাই দিন নাই তিনি হুক্কুটিকে লইয়া বসিয়া থাকেন। স্নান ও আহার নিয়ম মত করাইতে ভৃত্যেরা বেশ বেগ পাইতে লাগিল। ফলে রায়বাহাদুর-গৃহিণীর সমস্ত কোপ গিয়া পড়িল হুক্কুটির উপর। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন হুক্কুটির প্রতি কঠোর হওয়া অর্থে রায়বাহাদুরের অপ্রসন্নতা অর্জন করা তখন হুক্কুকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন ভৃত্যদের তিরস্কার করিতে। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ ফল ফলিল এমন মনে হইল না।

খাইতে বসিলে গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন ;—"কি যে ছাই একটা বাঁদর কিনেছে, তাই নিয়েই রাত দিন রয়েছে। সংসারের দিকে চাইবার যদি একটু ফুরসৎ হয় !"

রায়বাহাদুর বিনা প্রতিবাদে আহার করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া গৃহিণী কথার মাত্রা আরো একটু চড়াইয়া দিলেন ;—"তা বেশ তো !

ইচ্ছে হয় তো ওকে নিয়েই থাকো না। আমার কর্মভোগ কেন শুধু শুধু। পাঠিয়ে দাও না আমায় কোন তীর্থে।"

রায়বাহাদুরের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এ বয়সে পত্নী চলিয়া গেলে অন্ত কষ্ট কিছু হউক বা না হউক বিশেষ করিয়া খাইবার সময় যে কষ্ট হইবে তাহা স্মরণে আসা মাত্রই তিনি যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন। হাসিয়া বলিলেন ;—"একটা বাঁদর পুষছি তা পর্যন্ত তোমার সহ্য হয় না। তোমাদের জাতটাই বড়ো হিংসুটে!"

রসিকতা সহিবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না গৃহিণীর। গম্ভীর হইয়া তিনি কহিলেন ;—"তামাসা রাখো। সব সময়ে ভাল লাগে না।"

রায়বাহাদুর দেখিলেন রসিকতা ছাড়া এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। কহিলেন ;—"আচ্ছা সত্যি করে বলো তো, ওটাকে অতো আদর করি দেখে তোমার হিংসে হয় না ?"

গৃহিণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কহিলেন ;—"মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাতে তো বুঝতে সংসারে পুরুষের টান না থাকলে কি রকম মনে হয় সংসার মেয়েদের!" বলিয়া সেস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

রায়বাহাদুর মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ছোট্ট একটা বাঁদর পোষা লইয়া যে এতো কাণ্ড হইতে পারে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

রাত্রে গৃহিণী কাছে আসিলে কহিলেন,—"তুমি কি সত্যিই চাও না যে ওটাকে পুষি ?"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

"তা একথা আগে বললেই হতো। ওটাকে কিনতুম না।"

কেনায় ত আপত্তি নাই গৃহিনীর। আপত্তি শুধু সীমাতিরিক্ত উহার সংগের জন্ম। রায়বাহাদুরের হুকু থাকিবে না তো কি হুকু থাকিবে কুলি মজুরের !

গৃহিণী কহিলেন ;—"কিনবে না কেন ? কেনো না যতো খুশি। একটা ছেড়ে অমন পঁচিশটা কেনো না। বারণ করছে কে ? বলছিলাম, সব দিক তো দেখে শুনে সব করতে হয় ! তুমি স্নান করবে না নিয়মমত, খাবে না নিয়মমত, বেড়াতে যাবে না নিয়মমত। বলি, তোমার তো ঐ ভাঙা শরীর ! কতদিন চলবে বলো তো !"

রায়বাহাদুর তামাক টানিতেছিলেন। নেশাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল। বাক্যব্যয়ে পাছে উহা চলিয়া যায় এই ভাবিয়া চুপ করিয়া ছিলেন।

গৃহিণী কর্তার স্তব্ধতাকে তাঁহার কথার প্রতি অভিনিবেশ মনে করিয়া কহিলেন,—"বলি তোমার কিছু হলে কপাল ভাঙবে কার ? তোমার ঐ হুকুর না, আমার ? একবার ভেবে দেখেছো কি তা ?"

যে জন্ম কর্তা চুপ করিয়া ছিলেন তাহা গৃহিণীর কথায় ফাঁসিয়া গেলো দেখিয়া কথা কহিতে তাঁহার আর কোনো বাধা রহিল না। কহিলেন ;—"আচ্ছা, আচ্ছা, কাল থেকেই একটা লোক রেখে দেবো ওর কাছে। সেই সব দেখাশুনা করবে। আমি শুধু মাঝে মাঝে দেখবো। হয়েছে তো ?"

আর বিশেষ কোনো কথা হইল না। আলো নিভাইয়া দিয়া গৃহিণী শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন একটি লোক রাখা হইল। নাম তাহার মন্নু। মাহিনা হইল কুড়ি টাকা। দুইবেলা খাইবে ও দুইবেলা জলখাবারের পরিবর্তে পাইবে দুই আনা আর দুই আনা করিয়া চার আনা।

রায়বাহাদুরের সহিত হুক্কুটিকে লইয়া গৃহিণীর আর কোনপ্রকার কলহ হয় না। ঘড়ির মত নিয়মে রায়বাহাদুরের নাওয়া-খাওয়া সব চলিতে লাগিল; ভ্রমণ ও মোসায়েবদের সহিত ঠাট্টা-তামাসা চলিতে লাগিল।

রায়বাহাদুর কাশী যাইবেন। একটি ফুল সেকেণ্ডক্লাস কমপার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়াছেন। কিন্তু হুক্কুকে হাতে লইয়া কমপার্টমেণ্ট-এ উঠিতেই চেকার আসিয়া বাধা দিয়া জানাইল;—"ভাড়া লাগবে ওর।"

"কতো?"

"ডবল ভাড়া। এই" হিসাব করিয়া চেকার জানাইল;—"পঁচিশ টাকা সাত আনা দু পয়সা।"

"এতো?" রায়বাহাদুরের খুদে খুদে চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছানা-বড়ার মতো বড়ো বড়ো হইয়া আবার ছোট হইয়া আসিল।

চেকার বলিল;—"দেখুন আমরা তো কিছু করতে পারি না। ট্রেন কোম্পানির ব্যাপার।"

—"ও।" বলিয়া রায়বাহাদুর পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া অগত্যা দাম চুকাইয়া দিলেন।

কাশিতে যাইয়া যে-বাড়িটি ঠিক ছিল তাহা না পাওয়াতে ছোটমত একটি বাড়ি দেখিয়া রায়বাহাদুর তাঁহার সংসার লইয়া উঠিয়া গেলেন। সকলের সুবিধা হইল কিন্তু অসুবিধা হইল হুক্কুটির। গাছের ডালে সে আর ঝুলিতে বা ঘুরিতে না পারিয়া শেষে ঘরে ঘরে আন্‌লায়, দড়িতে, সিলিং-এ, মশারিতে ঝুলিতে আরম্ভ করিল। মুশকিল বুঝিয়া রায়বাহাদুর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বাঁধিতে গেলেই এমন

সকরুণ নেত্রে ও তাকাইত রায়বাহাদুরের দিকে যে তখনকার মতো বাঁধা স্থগিত্ রাখিয়া উহাকে কোলে লইয়া তিনি আদর করিতে শুরু করিতেন।

যে-পাড়ায় থাকিতেন তিনি সে-পাড়ায় চাঞ্চল্য পড়িয়া গেলো। অনেক লোক আসিতে লাগিল তাঁহার বাড়ি।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল;—"কতো দিয়ে কিনলেন মশায়?"

কেহ জিজ্ঞাসা করিল;—"খুব তেজী দেখছি এটা, সাধারণত এগুলো তেজী হয় না একদম। খুব যত্ন করেন নিশ্চয়।"

কেহ বলিল,—"ক্যালকাটা জু-তে এমন হুক্কু দেখিনি মশায়, আর কি বলবো!"

কখনো মৃদু হাসিয়া, কখনো চোখ টিপিয়া, কখনো বা ছোট্ট দুই একটি কথা কহিয়া সকলের কথার উত্তর দিতেন তিনি।

শেষে এমন হইল যে বেনারস হইতে চলিয়া আসিবার দিন তিন-চারেক আগে অকস্মাৎ একদিন তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, এখানে তাঁহাকে রায়বাহাদুর নটবরচন্দ্র দাস বলিয়া কেউ চেনে না, চেনে 'হুক্কুওলা-বাবু' বলিয়া।

সেই যে বেনারস হইতে হুক্কু ফিরিয়াছে সেই অবধি তাহার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাইতেছে না। সে-উৎসাহ ও গাছের ডালে ডালে লম্ফ দিয়া বেড়াইবার সে-উত্তেজনা ও সে-শক্তি তাহার নিভিয়া গিয়াছে। সর্বদাই এখন সে চক্ষু দুইটি লাল ও অর্ধনিমিলিত করিয়া থাকে খাঁচার ভিতর। কচিৎ কখনো বাহিরে আসে। বাহিরে আসিলেও সে-ভাবে আর ডাকে না, সে-ভাবে ডালে ঝুলিতেও পারে না। অতি কষ্টে কখনো 'হুক্' করিয়া একটু জানান দেয় যে ডাকিতে সে ভুলিয়া যায় নাই;

তাহাও রায়বাহাদুরের স্বয়ং অনেকক্ষণ অনুরোধ ও আদর আপ্যায়ন করিবার পর।

কেহ বলিল উহার নজর লাগিয়াছে; কেহ বলিল উহাকে কেহ বান মারিয়াছে; কেহ বলিল উহার টি.বি. হইয়াছে। সকলের মত যতই পৃথক হউক এটুকুতে তাহারা সকলে একমত যে, উহার কিছু-না-কিছু একটা হইয়াছে!

প্রথম হইতেই রায়বাহাদুর চিন্তিত ছিলেন। এখন মাস খানেক হইতে চলিল তবু কোনো প্রতিকার হইল না দেখিয়া সত্যই তাঁহার দুশ্চিন্তা দেখা দিলো। কি যে করিবেন আর কি যে করিবেন না, কি করা যে উচিত আর কি করা যে অনুচিৎ সমস্তই তিনি গুলাইয়া ফেলিলেন। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া একদিন ডাক দিলেন শহরের খ্যাতনামা ডাঃ চৌধুরীকে।

ডাঃ চৌধুরী আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন বত্রিশ টাকা ভিজিট লইয়া। ও বলিয়া গেলেন কাল সকালে কেমন থাকে ফোন করিয়া জানাইতে। মন্নুকে ডাকিয়া রায়বাহাদুর নিজে সব ঔষধাদি বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন প্রত্যূষেই যেন তাঁহাকে খবর দেওয়া হয় কেমন থাকে হুক্কুটি। তাঁহাকে ফোন করিয়া জানাইতে হইবে ডাক্তারকে।

অতি প্রত্যূষেই তাঁহার কাছে খবর গেলো। তিনি জাগিয়াই ছিলেন। দু-একবার ডাকিতেই তিনি উঠিয়া আসিলেন। মন্নু জানাইল যে হুক্কুটি গতকাল রাত হইতে একটু ভালো আছে।

ডাঃ চৌধুরীর পুরিয়া খুব কাজ করিয়াছে বলিতে হইবে। তখুনি রিসিভার তুলিয়া লইয়া রায়বাহাদুর ফোন করিলেন ডাক্তারকে।

ডাক্তার সব শুনিয়া কহিলেন,—"আমি তো আপনায় বলেছিলাম

কাল দেখেই যে আমি খুব হোপফুল আছি। আচ্ছা, আজ পাঠিয়ে দেবেন গাড়ীটা একবার বিকেলের দিকে। সাড়ে পাঁচটায় একটা য়্যাপঅয়েন্টমেণ্ট রয়েছে। পাঁচটায় পাঠাবেন।"

"সকালের দিকে একবার" রায়বাহাদুরের মিনতি কাতর কণ্ঠ।

"সকালের দিকে যাবার কোনো দরকার নেই।" একটু থামিয়া, —"অবশ্য যদি বলেন তো যাচ্ছি।" একটু—"কাইণ্ডলি একটু সময় ক'রে আসুন না দশটার পর।"

"আচ্ছা।"

বত্রিশ টাকা ভিজিট লইয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় ডাক্তারকে আবার বিকালে আনিব বলিয়া কথা দিতে হইল। বিকালেও তিনি আসিলেন। বত্রিশ টাকা ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন।

সুখের বিষয় হুকু সারিয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন টেনিস্ খেলিতে খেলিতে মাথার শির ছিঁড়িয়া গিয়া রায়বাহাদুরের ছোট ছেলে শয্যাশায়ী হইল। রায়-বাহাদুরের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ন ডাঃ সেন বলিলেন,—"আমি তো ভালো মনে করছিনে মিঃ দাস। যদি মেনিঞ্জাইটিস্-এ টারন্ নেয় তো বাঁচানো শক্ত হবে।"

পাংশু মুখে রায়বাহাদুর কহিলেন ;—"কি হবে ডাক্তার ?"

—"অতো ভয় পাচ্ছেন কেন ? ডাঃ বোসের সঙ্গে কনসাণ্ট করি একবার।"

—"করো, এখুনি করো ডাক্তার। যতো টাকা লাগে আমি দেবো। টাকার পরোয়া তুমি করো না।"

ডাঃ বোসকে রাত্রেই কল্ দেওয়া হইল। রাত্রে কোথাও তিনি বাহির হন না। 'ডবল্' ভিজিটে আসিতে রাজী হইলেন।

প্রায় অর্ধঘণ্টা ধরিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া ডাঃ বোস কহিলেন;—"হু।" পরে বাহিরে আসিয়া রায়বাহাদুরকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন;—"দেখুন, টু বি ফ্রাঙ্ক উইথ ইউ, দি কেস ইজ ভেরী সিরিয়াস।"

ধরা গলায় রায়বাহাদুর কহিলেন;—"তাহলে কি কোনো আশা নেই?"

"এ্যাট লিষ্ট কালকের সকালটা না কাটলে কিছু বলা যাচ্ছে না।"

রায়বাহাদুরের চোখে জল আসিল। মাথায় তাঁহার আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। রায়বাহাদুর-গৃহিণী পাগলের মতো হইয়া গেলেন। চোখে জল নাই, মুখে কথা নাই, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছেন ছেলের দিকে। গৃহিণীর এই অবস্থা দেখিয়া রায়বাহাদুরের বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল!

আবার তাঁহার স্মরণে আসিল তাঁহার ছোট বধূমাতা এখানে নাই। দিন চারেক হইল বাপের সংগে কাশ্মীর বেড়াইতে গিয়াছে। সে যখন আসিয়া শুনিবে কতো বড়ো সর্বনাশ তাহার হইয়া গিয়াছে তখন তাহার যে কি অবস্থা হইবে তাহা চিন্তা করিতেও তাঁহার বক্ষে শেল বিঁধিতেছিল! আহা! অমন ফুলের মতো মেয়ে! বিবাহ তো হইয়াছে এই বৎসর খানেক। পুত্রসন্তানও হয় নাই যে আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া থাকিবে! ভাবিতে ভাবিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল রায়বাহাদুরের।

রাতারাতি নার্স বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ঘরে যাইতে পা সরিতেছিল না তাঁহার। নার্সকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

নার্স উত্তর দিলো ;—"আগের মতন। তবে একটু যেন ভালো মনে হচ্ছে। পালস কমে এসেছে আগের চেয়ে।"

"কতো

"একশ' কুড়ি।"

ঘন অন্ধকারে ক্ষীণ আশার আলো যেন দেখিতে পাইলেন রায়বাহাদুর। যাক, কোনরকম করিয়া যদি সকাল পর্যন্ত কাটাইয়া দেওয়া যায় !

শেষে ভোর হইয়া আসিল। রায়বাহাদুর আবার ফোন তুলিয়া লইলেন। ডাক্তার বোসের সঙ্গে তাঁহার কথা হইল। তিনি আসিতেছেন। তবে ডাঃ সেনকে যেন আনাইয়া নেওয়া হয় ইতিমধ্যে। কনসালটেশানের সুবিধা হইবে তাহা হইলে।

সেদিনের সকাল ও রাত্রি, ও শেষে তাহার পর পুরা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেলো বটে কিন্তু রোগীর চেতনা আসিল না। প্রতি মুহূর্তে খারাপ হইতে লাগিল রোগীর অবস্থা। শেষে ডাঃ বোসও "হোপলেস" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রায়বাহাদুরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ঘন ঘন তাঁহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে এক কাণ্ড ঘটিল। রায়বাহাদুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল মন্নু। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল ;—"বাবু।"

"কে ?" চমকিয়া উঠিলেন রায়বাহাদুর।

"আজ্ঞে আমি মন্নু।"

"ও।" রায়বাহাদুর আবার শুইয়া পড়িলেন।

মন্নু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল ;—"বলছিলুম কি, দাদাবাবুর জন্যে আমি একবার শেষ চেষ্টা করবো কি ?"

"সকলে যখন হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো তখন তুই আর কি করবি মন্নু!" গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কথাগুলি বলিলেন রায়বাহাদুর।

"গ্রামে আমাদের একটা চলতি কথা আছে বাবু যে, বাড়িতে ছুটো অসুখ করলে একজন মরে গেলে অপরের আর কোনো ভয় থাকে না।" একটু থামিয়া মন্নু আবার বলিতে লাগিল;—"তা এ-বাড়িতে তো অসুখ করেছে দাদাবাবুর আর ছকুটার। ছকুটাকে মেরে ফেললে দাদাবাবু বাঁচলেও বাঁচতে পারেন।"

ম্লান হাসিয়া রায়বাহাদুর কহিলেন;—"বাঁচা যদি অত সহজ হতো রে?" পরে একটু দম লইয়া কহিলেন;—"তা শেষ পর্যন্ত তোর আর আক্ষেপ থাকে কেন? নে কর যা ভালো বুঝিস্!"

মন্নুকে আর কিছু বলিয়া দিতে হইল না। উগ্র বিষ খাওয়াইয়া মিনিট তিনেকের মধ্যে ছকুটার দেহ নিষ্পন্দ করিয়া দিলো সে। ও তাহার পর ছকুটার প্রাণহীন দেহটিকে পথের ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই রায়বাহাদুরের বাড়ির গুমোট ভাব কাটিয়া গেলো। দুদিনের হতচেতন রোগী চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে।

মুহূর্তমধ্যে ফোন করিয়া আবার ডাক্তার বোসকে আনানো হইল। ডাঃ বোস আসিয়া পরীক্ষা করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। কহিলেন;—মিরাক্যুলাসলি ইমপ্রুভড্ ষ্টিল ইট ইজ এ মিষ্ট্রী টু মি। কেমন ক'রে যে ঐ কোলাপসিং হার্ট-এর রিভাইভিং পাওয়ার ফিরে আসতে পারে!" পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন;—"দেয়ার আর মোর থিংগ্স ইন হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ হোরেসিও দ্যান আর ড্রিম্ট অব ইন ইওর ফিলোজফী।

রায়বাহাদুরের ছেলে বাঁচিয়া গেলো এ যাত্রায়। রায়বাহাদুরের মুখে আবার হাসি ফুটিল। গৃহিণীর চোখের জল শুকাইল। আবার তিনি সাধারণ দিনের নিয়মে কাজে লাগিলেন।

সকলের মনে আনন্দের বান ডাকিল।

মন্নু প্রচুর পুরস্কার পাইল।

যাহারা কুকুর জাত তাহারা চিরটাকালই রায়বাহাদুরদের জন্য এইভাবে মরিয়া আসিতেছে।

বেল্ বাজে

শ্যামল ও শুভা বেড়াইয়া ফিরিতেছে। তখন রাত আট-টা। প্রত্যেক শনিবারই সন্ধ্যাবেলা তাহারা দুইজনে এইরূপ ভ্রমণে বাহির হয়। বাসে করিয়া লেক রোডে গিয়া নামে। সেখানে কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ট্রামে বা বাসে করিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিয়া নামে। শুভা মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলে চলিয়া যায়। শ্যামল সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে তাহার পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুদের মজলিসে গিয়া প্রবেশ করে। সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া বাড়ি ফেরে দশটায়।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রাম থামিতেই শুভা ও শ্যামল নামিয়া পড়িল।

শ্যামল কহিল,—"চল, আজ তোমায় হোষ্টেলে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

শ্যামল ও শুভা পথ হাঁটিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা মেডিকেল কলেজের গেট দিয়া অন্ধকার মাঠে প্রবেশ করিল।

শুভা কহিল,—"আজ তোমার কি হয়েছে? সারাটা পথ চুপ করেই আছো। কথা কইছ না যে?"

শ্যামল কিছু কহিল না, কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

শুভা শ্যামলের দিকে একবার তাকাইল। অন্ধকারে তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখিতে পাইল না। পুনরায় শুভা কথা কহিল,—"কি হয়েছে তোমার!"

শ্যামল মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিল, কহিল,—"তোমার শুনে কি হবে?"

শুভা ব্যথিত হইয়া কহিল,—"যদি আমাকে বলবার না হয় তো বলো না।"

শ্যামল শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—"তা নয় শুভা। শুনে মিথ্যে কষ্ট পাবে।"

শুভা পুনরায় কহিল,—"শুনে নয় তোমার কষ্টের একটু ভাগ নিলাম। তাতেও কি তোমার কোনো আপত্তি আছে?"

শ্যামল চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। এতবড় নিষ্ঠুর সত্য কেমন করিয়া সে শুভাকে বলিবে? তাহার কোমল নারী-হৃদয়ে বিমল যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা সে ত জানে!

আবার এও ভাবিল যে গোপন করিয়াই বা কি হইবে? শুভা ত একদিন জানিতেই পারিবে। তাই একটু থামিয়া কহিল,—"বিমল আজ চারদিন হলো" হঠাৎ তাহার জিভ যেন আর নড়িতে চাহিল না, কতকটা যেন জোর করিয়াই সে কহিল,—"মারা গেছে।"

শুভার বুক একবার ধ্বক করিয়া উঠিল। বিমল মারা গেছে! বিমল! শ্যামলের ছোট ভাই বিমল! আহা! তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে, হিন্দু স্কুলে পড়ে, এইবার ফার্ষ্ট হইয়া সেকেণ্ড ক্লাস হইতে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়াছে। কি সুন্দর দেখিতে! শুভা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। এই ত সাতদিন আগে গত রবিবারে

সে শ্যামলের লেখা একটি চিঠি হোষ্টেলে আসিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে। শুভার পা'দুটি যেন অকস্মাৎ অবশ হইয়া আসিল।

শুভা রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিল?"

শ্যামল ধরা গলায় কহিল,—"কিছু না। ঘুড়ি ধরতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল।" কথার শেষে শ্যামল একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল।

"ইস্—স্-স্!" ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইয়া একটি ধ্বনি করিয়া শুভা কহিল,—"কোন কিছুই করা গেল না?"

"না। স্কাল্‌টা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো! ছাত থেকে মাথা নিচু করে পড়েছিল কি না?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া এই মর্মন্তুদ সংবাদ শুনিল শুভা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কেহ কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, কেহ কাহারো মুখের দিকে তাকাইতেও পারিল না। কেবল নিস্প্রাণ মাটিতে দুই জোড়া পদের ক্ষীণাঘাত প্রতিঘাত শোনা যাইতে লাগিল। চারিদিকে জাগিয়া রহিল অন্ধকারের কুহেলিকা।

শুভা ভুলিয়া গেল তাহার হোষ্টেল, ভুলিয়া গেল সে মেডিকেল সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। ভুলিয়া গেল দশটায় তাহাদের হোষ্টেলের শেষ ঘণ্টা পড়ে, আর ঐ সময়ের মধ্যে হোষ্টেলে ফিরিয়া না আসিলে লেট্‌বুকে সহি করিতে হয় ও তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন মিস্ সেনকে।

শুভার কণ্ঠ তখনো রুদ্ধ,—"এই মাঠটাতে একট বসবে?"

"চল!"

মাঠে রুমাল বিছাইয়া বসিল দুইজনে। শুভা কোন প্রকারেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছিল না। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল,

বিমল নাই। কিন্তু বিমল নাই ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? এত বড় মিথ্যা কথা আজ কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে? এই চারদিন পূর্বে সে এই পৃথিবীর বুকে চলিয়া বেড়াইতেছিল, আনন্দে খেলধূলা করিয়াছিল, এই রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া স্কুলে গিয়াছিল, টিচারকে পড়া দিয়াছিল—সে আজ অকস্মাৎ চিরদিনের মত চলিয়া গেল। এই পথ দিয়া সে আর হাঁটিবে না, স্কুলে যাইবে না, পড়া দিবে না ক্লাশে টিচারকে, খেলিবে না, দৌড়াইবে না, কেহ তাহার স্বর আর কোনদিন কোথাও শুনিতে পাইবে না, কি আশ্চর্য! কি অভাবনীয় অচিন্তনীয় নির্মম সত্য! বিশ্বাস হয় কি করিয়া?

অন্ধকারে শ্যামলের দিকে একবার তাকাইল শুভা! শ্যামল মাটির দিকে চাহিয়া ছিল।

শুভা ডিসেক্‌সনের ক্লাস করিয়াছে। মৃত দেহকে কর্ক দিয়া চিরিয়া চিরিয়া প্রফেসার বুঝাইয়াছে দেহের কোথায় কোন ভেন, কোথায় কোন আর্টারী, কোথায় কোন হ্যাম্‌ ষ্ট্রীং।

কিন্তু তখন তাহার সুক্ষ্মতম এতটুকু ভয়ও করে নাই, তাহার মন এক বিন্দুও চিড় খায় নাই। শুধু এক দুর্নিবার কৌতূহল ও বিস্ময়ের ঢেউয়ে সে তলাইয়া গিয়াছে। মানুষের দেহের অভ্যন্তর! হার্ট লাঙস্‌ লিভার, কিড্‌নি, মাংসপেশী, মেমব্রেণ, হাড়, মজ্জা হাজার হাজার শিরা-উপশিরা—কি বিরাট অভাবিত বিস্ময়কর সাম্রাজ্য! একটি বিনা অপরটি বাঁচিতে পারে না, একটি বিকল হইলে অপর সবগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পরস্পর ইহারা কি নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ! কি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ইহারা বিধিমত কার্য করিতেছে; প্রাণ পরমাণুকে দেহের অভ্যন্তরে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এতকাল ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছে তাহার। সে

পাইয়াছে সাহস, হৃদয়ে সে সঞ্চয় করিয়াছে বল বীর্য ও সামর্থ। কিন্তু অন্ত শুভা ভয় পাইল। কোথায় চলিয়া গেল বিমল? তাহার মস্তিষ্কের অন্তরালে সেই আশ্চর্যকর অচিন্তিতপূর্ব পৃথিবী ত তেমনি জাগিয়াছিল!

শুভা মুখ তুলিয়া সম্মুখের ঘন অন্ধকারের দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। মনে কোন কথা আসিল না। শেষে যেন যন্ত্রচালিতের মত প্রশ্ন করিল,—"মাসিমা খুব কাঁদছেন ত?"

"কাঁদলে ত ভাল হোত। শোকটা বেরিয়ে যেত" শ্যামল জানাইল।

"কি করছেন?"

"বিমলকে যেখান থেকে তুলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় আজ পর্যন্ত সেই জায়গায় বসে আছেন। খাচ্ছেন না, ঘুমুচ্ছেন না, উঠছেনও না।" শ্যামল শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল,—"সত্যি, মাকে দেখলে খুব কষ্ট হয়।"

শুভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল দুর্ভেদ্য পাষাণের মত কি একটা পদার্থ যেন ক্রমশঃ চাপিয়া বসিতেছে তাহার বুকে।

শ্যামল কহিল,—"আমরা তো কাজ কর্ম নিয়ে দুদিনে সব ভুলে যাব। মায়েরই ভুলতে সময় নেবে।" একটু থামিয়া কহিল,—"মনে করেছি মাকে গীরিডিতে মাসীমার কাছে রেখে আসবো। ওখানে থাকলে তবু পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কয়ে অন্যমনস্ক থাকবেন। এখানে থাকলে সেই ঘর, সেই খাট, বিমলের সেই সব স্মৃতি।"

শুভা কি বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু শ্যামলের কথার রেষ টানিয়া কহিল,—"সেই ভাল ওঁকে গীরিডিতেই রেখে এস।"

শ্যামল কহিল,—"ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছি। এখন মঞ্জুর হলে

হয়। ওঁকে পাঠানো তো আর অন্য কাউকে দিয়ে হবে না। নিজেকেই যেতে হবে। তবু আমাকে দেখে খানিকটা সুস্থির হবেন।”

শুভা কহিল,—“বিমলকে উনি খুব ভালবাসতেন, না?”

“হ্যাঁ, খুবই ভালবাসতেন। সকলের চেয়ে ছোটো তাছাড়া বিমল হতেই বাবা মারা যান। মা ওকে কোলে নিয়েই বাবার শোক ভুলে ছিলেন। বলতেন, ‘উনি আমায় বিমুকে দিয়ে গেছেন’।”

শুভার চোখে জল আসিল না। কেবল ভিতরটা শুকাইয়া কাঠের মত শক্ত ও রসহীন হইয়া যাইতে লাগিল। জীবনের আরো একটা ভীষণ ও ভয়াবহ দিক আছে তাহার সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয় হইল।

শ্যামল অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিল;—“যাকগে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। ভেবে আর মন খারাপ করে কি হবে? যে যাবার সে যাবেই, তাকে কেউ আঁটকাতে পারবে না।”

শুভা উত্তর দিল,—“তা তো বটেই। ঠিকই বলেছ। ভেবে আর মন খারাপ করেই বা লাভ কি? ও তো আর ফিরে আসবে না!”

হঠাৎ শ্যামল পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল ও ঘড়ি দেখিয়া কহিল,—“সাড়ে নটা বাজে এবার ওঠ।”

শুভা উঠিল। শ্যামলও উঠিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে চলিতে লাগিল।

শুভা কহিল—“ওদিক দিয়ে কেন যাচ্ছ? ওদিকে যে মর্গ পড়ে।”

শ্যামল একটু হাসিয়া কহিল,—“ওদিক দিয়ে যেতে ত প্রত্যেক বারই বারণ কর। চল না আজ ঐ দিক দিয়ে ঘুরেই যাওয়া যাক। দেখেই যাই না মর্গটা।”

শুভা আর কোন কথা কহিল না, বাধা দিল না। পথ চলিতে লাগিল ধীর মন্থর পায়ে।

মর্গের নিকট আসিয়া শ্যামল দেখিল মর্গ-বিল্ডিং-এর গায়ে ছোট একটি ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলিতেছে। বাল্বটি ২৫।৩০ ক্যাণ্ডল-পাওয়ারের হইবে। কাজেই স্থানটি অর্ধেক আলোকিত এবং সেই আধো আলোকিত ও আধো অন্ধকারের নিচে খাটিয়া পাতিয়া চার পাঁচ জন হিন্দুস্থানী তাস খেলিতেছে ও গল্পগুজব করিতেছে। তাহাদের দিকে শ্যামল কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল,—"এরা রোজই খেলে নয়? কত রাত পর্যন্ত খেলে?"

শুভা জানাইল,—"রোজ নয়। আজ শনিবার কিনা শিগগির ছুটি হয়েছে। তাই বসে একটু খেলছে। রাত বারোটার পর তো সব আলো নিভে যায়। তখন ওরা শুয়ে পড়ে।"

শ্যামল ও শুভাকে ঐরূপ অসময়ে মর্গের নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া হিন্দুস্থানীরা তাস খেলিতে খেলিতে বার কতক তাকাইয়া দেখিল। নিজেদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা কহিল। কেহ বোধহয় একটু হাসিলও।

শ্যামল কিছুদূর আগাইয়া প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা মর্গে ত আনক্লেমড ডেড্ বডিগুলো ষ্ট্যাক্ করা থাকে না?"

"হুঁ" শুভা জানাইল।

"কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে? আমরা ত শুনেছি চব্বিশ ঘণ্টা রাখা হয়।"

"হ্যাঁ। চব্বিশ ঘণ্টার পর কেউ নিতে না এলে এখানকার লোকেরাই পুড়িয়ে দেয়।"

"রোজ অন্ততঃ কতগুলো ডেড্ বডি ওখানে জমা হয়?" শ্যামল প্রশ্ন করিল।

"দু-তিনটে ত বটেই।" শুভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, —"আজকেই ত সকালে একটা ডেড্ বডি আমার ওয়ার্ড থেকে গেছে।"

"তোমার ওয়ার্ড থেকে?" শ্যামল জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের কি পলিক্ বেড় এ্যাটেণ্ড করতে হয়?"

"হ্যাঁ, সেকেণ্ড ইয়ার থেকেই শুরু হয়। তবে খুবই কম ক্লাস থাকে।"

"পেসেন্টটির কি হয়েছিল?"

"ক্যান্সার, খুব ভুগে ভুগে মারা গেছেন ভদ্রলোকটি।" শুভা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"বোধহয় ফ্যামিলির সঙ্গে কিছু হয়েছিল। বৌ, ছেলে, মেয়ে সব দেখা করতে আসতো কারোর সঙ্গেই দেখা করতেন না। অবস্থাও ত মন্দ ছিল না, বাড়িতেই চিকিৎসা করাতে পারতেন। কিন্তু সেই যে হাসপাতালে চলে এলেন শেষ দিন পর্যন্ত রইলেন। ওঁর ওখানেই আমার বেশি ডিউটি থাকতো।"

"কতদিন বেঁচেছিলেন?"

"প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস।"

"ওঁর বডি বৌ ছেলেরা নিয়ে গেল না?"

"না। ওঁর মানা ছিল।" শুভা বলিল,—"আমি তাঁকে কত বোঝাতুম। কিন্তু কিছুই তিনি শুনতেন না।"

"তাহলে এখনো মর্গে ওঁর বডি পড়ে আছে?"

"হ্যাঁ", শুভা মাথা নাড়িল,—"হাসপাতালের নিয়ম চব্বিশ ঘণ্টা ত রাখতেই হবে। পরে এখানকার লোকেরাই পুড়িয়ে দেবে।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। আশপাশে আর কাহারো সাড়াশব্দ নাই। হিন্দুস্থানীদের জটলাও আর শোনা যাইতেছে না।

সম্মুখের লোহার গেট পার হইয়া বাম দিকে বাঁকিয়া কিছুদূর দু'জনে আসিতেই হোষ্টেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

শুভা যেন এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পথ হাঁটিতেছিল।

তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল কোথায় কে জানে? যেন এই বিশ বছরের চলা-হাঁটার অভ্যাসেই শুধু তাহার পদদ্বয় তাহাকে ঋজু রাখিয়াছিল, পড়িয়া যাইতে দেয় নাই।

এখন হোষ্টেলের বেল্ শুনিয়া সে দ্রুত দুই তিন পা আগাইয়া গেল। শ্যামলও একটু পা চালাইল।

হোষ্টেলের দ্বারে প্রবেশ করিতে করিতে শুভা হাসিয়া কহিল, —"আসছে শনিবার!"

শ্যামল হাসিয়া জানাইল,—"হ্যাঁ এখানে থাকি ত আসবো।"

শুভা "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামল একা ফিরিল। এইরূপ একা ফিরিতে ফিরিতে অকস্মাৎ সে থামিয়া দাঁড়াইল। মৃত বিমলের সহিত শুভার হোষ্টেলের ভিতর বেল বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অন্তর্ধানের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষীণ সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইল সে। শুভা এতক্ষণ তাহার পার্শ্বে ছিল, তাহার সহিত পথ হাঁটিতেছিল, কথা কহিতেছিল, তাহার উষ্ণ প্রাণের সান্নিধ্য সে অনুভব করিতেছিল ধমনীর প্রতিটী লাল রক্ত বিন্দুতে। কিন্তু তাহারও সময় যে নিরূপিত ছিল, তাহারও সময় যে ফুরাইয়া আসিতেছিল, তাহা তো উভয়ের কাহারো স্মরণ ছিল না।

বিমলের তবু সময় লাগিয়াছিল অর্ধ ঘণ্টা। শুভার আধ মিনিটও সময় লাগিল না। হোষ্টেলের ঐ খোলা বিরাট দ্বারের বাঁকে সে মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহার দৃষ্টিপথ হইতে। শুভাকে যে যাইতেই হইবে! তাহার যাইবার বেল্ যে বাজিয়াছে! বাহিরে থাকিবার সময় যে তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে!

এখন তাহার চারিদিকে ইঁটের গাঁথুনীর অভ্রভেদী সাঁজোয়া পাহারা। আজ এই রাত দশটা হইতে কাল বেলা সাতটা পর্যন্ত

তাহাকে এই সীমাবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে কাটাইতেই হইবে। এই সুদৃঢ় দুষ্প্রবেশ্য যবনিকা ভেদ করিয়া শ্যামলের ভিতরে যাইবার শক্তি নাই, শুভারও বাহিরে আসিবার সামর্থ নাই। হয়তো হোষ্টেলের ভিতর শুভা গল্প করিবে, হাসিবে, গান গাহিবে, বন্ধুদের সহিত জটলা করিবে, কিন্তু বাহিরের পৃথিবী হইতে সে চ্যুত, ছিন্ন। শ্যামলের দৃষ্টিপথ হইতে সে বহু যোজন দূরে। এই নয় ঘণ্টার জন্য শুভা আজ তাহার কাছে মৃত বিমলের মতই।

অকারণেই মর্গের পার্শ্বের পথ দিয়া শ্যামল আবার ঘুরিয়া আসিল। হিন্দুস্থানীরা তখনো তাস খেলিতেছে। চারিদিকে তখনো অন্ধকার। চতুষ্পার্শ্বে কেহ কোথাও নাই।

হঠাৎ আলো জ্বালিয়া একটি এ্যাম্বুলেন্স তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। হয়তো কোন আহত বা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বহন করিয়া আনিয়াছে, হয়তো তাহার দেহ শেষে ঐ মর্গে পড়িয়া থাকিবে। চব্বিশ ঘণ্টার পর এখানকার লোকেরাই তাহা পোড়াইয়া দিবে।

যে মাঠে বসিয়া তাহারা দুজনে এতক্ষণ গল্প করিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল সে। সেই স্থান জাগিয়া রহিয়াছে, ঘাসগুলি পর্যন্ত নুইয়া রহিয়াছে, শ্যামল নিজেও রহিয়াছে কিন্তু শুভা নাই! সে চলিয়া গিয়াছে। এখন এই মুহূর্তে তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না, কোনো অনুনয়েই সে ফিরিয়া আসিবে না।

পথে আসিতে আসিতে বিমলের কথা স্মরণ হইল তার। তাহার জন্যও নিশ্চয় কোথাও বেল্ বাজিয়াছে। কেহ জানে না, কেহ শুনিতেও পায় নাই। কিন্তু যাহার জন্য বাজে সে বুঝি শুনিতে পায়! এক মুহূর্ত আর এখানে থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব কি করিয়া? সব কাজ ফেলিয়া যে তাহাকে যাইতেই হইবে! সময় মত হাজির না হইতে

পারিলে লেট-বুকে যে সই করিতে হইবে, ওয়ার্ডেনকে যে তাহার জন্ত কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া শ্যামল দেখিল সকলে তাহার জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মা এক নূতন কাণ্ড করিয়াছেন। ঘরে টাঙানো বিমলের ছোট বেলাকার ছবিটি কোন ফাঁকে পাড়িয়া লইয়াছেন কেহ জানে না। কিছু মিষ্টি হাতে তুলিয়া লইয়া বিমলকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কিছু বলিলে বলিতেছেন ;—"ও যে এই সময় খায়! ও যে একটু আগে আমাকে এসে বললে, 'মা মিষ্টি খাবো'।"

শ্যামল দেখিল ছবিটির সর্বাঙ্গে গুঁড়া গুঁড়া মিষ্টি মাখানো!

শ্যামল কিছু কহিল না, আস্তে আস্তে পার্শ্বের ঘরে গিয়া চাপা গলায় কমলকে কাছে ডাকিয়া কহিল,—"গিরিডিতে মাসিমাকে ওয়ার্ ক'রে দে। মাকে নিয়ে কাল যেতেই হবে। নয়তো মা পাগল হয়ে যাবে।"

"অফিস থেকে ছুটি—" কমল বলিতে চেষ্টা করে।

"ছুটি না পাই কামাই করবো।" শ্যামলের কণ্ঠ গম্ভীর।

কমল দ্রুত বাই-সাইকেলে করিয়া ওয়ার্ করিতে বাহির হইয়া গেল!

অভিসারিকা

কুমোরডাঙার পনেরো মাইল আরও দূরে চকাশারের মাঠ। আয়তনে হবে বোধ করি এক-শো কুড়ি থেকে পঁচিশ বিঘা। ঘাস জন্মে গেছে প্রায় হাত দেড়েক উঁচু। বুকের ওপর দিয়ে যাতায়াতের সরু পথটি ক্রমশঃ গেছে হারিয়ে। মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠে সমস্ত বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সন্ধে তো দূরের কথা দিন দুপুরেও কেউ ওর ওপর দিয়ে কখনো আনাগোনা করে না।

ভোরের আমেজ শহরকে রঙীন ক'রে তোলবার আগেই একদিন দেখা গেলো চকাশারের মাঠ সাফ হয়ে গেছে। ঘাসের ছোট্ট একটি শিষও মাথা তুলে নেই। মাঝে মাঝে শুধু উইঢিপির মতো ছাঁটা ঘাস সাজানো রয়েছে।

মাঠের দক্ষিণ কোণে তাঁবু পাতার আয়োজন চলেছে। বাঁশের খোঁটা আর মাপ ক'রে দড়ি কেটে নেওয়া হচ্ছে। দশটার মধ্যে দেখতে দেখতে চলনসই একটি তাঁবু তৈরী হয়ে যায়।

বেলা সাড়েদশটায় মাঠের শেষে এসে লাগে একটি চকলেট্ রঙের ড্যামলার। বেঁকানো ফেল্ট হ্যাট আর খাকীর সুট পরে গাড়ী থেকে নামলেন মিঃ ফ্রান্সিস, শহরের বিখ্যাত কণ্টাক্টর। এঁর আফিসে

কন্ট্রাক্ট আসে ব্রীজের, এরিয়োড্রোমের অর্থাৎ লাখো লাখো টাকার লেনদেন চলে সেখানে।

সমস্ত দুপুর ধরে মিঃ ফ্রান্সিস্ মাঠের এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে হাতের লাঠি দিয়ে মাটি টিপে টিপে দেখতে লাগলেন। একটু থেমে যেখানে ইংগিত করেন বাঁশের খোঁটা পোঁতা হয় সেখানে।

ভোরের আলো তখনো শীতের কুয়াসায় ঢাকা। চকাশারের মাঠ মুখর হয়ে উঠেছে। হাজার মজুর লেগেছে।

দশজন ক'রে এক একটি দল গঠিত। বড়ো বড়ো শালকাঠের গুঁড়ি কাঁধে ক'রে একদল বয়ে আনছে। দশজনের আর একটি দল তা বয়ে দিচ্ছে কিছুদূরের অপর একটি দলকে। মাঠের মাঝখানে ওগুলো সার সার শুইয়ে রাখা হচ্ছে।

চূণ, শুরকী, খোয়া সব লরী লরী এসে জমা হ'চ্ছে মাঠের শেষে। চুণ যারা বইছে তাদের দলে দু'জন ক'রে। দুমণী গামলায় চূণ ভর্তি ক'রে দিচ্ছে গাড়ীর ওপর থেকে কোদাল দিয়ে দু'জনে। দুপাশের দুটো কড়া ধরে দুজনে তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিছুদূরে। সেখান থেকে আবার দুজন। দশটা লরির সামনে দশটা লাইন লেগেছে দুজন ক'রে লোকের।

খোয়া আর শুরকী বয়ে নিয়ে যাবার লাইনে একজন। মাথায় আধমণী ঝুড়িতে খোয়া নিয়ে একটির পর একটি ক'রে চ'লেছে পঞ্চাশ জন। দশ হাত ক'রে ব্যবধান মধ্যে। এক একটা পাক ঘুরে আসে আর এক এক ঝুড়ি ক'রে খোয়া তুলে নেয় মাথায়।

শুরকী খোয়ার মতো নিয়মেই বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চকাশারের মাঠের দিকে চাইলে আজ চমক লাগে। রাতারাতি যেন যান্ত্রিক সভ্যতার চাবুক এর মতো একটা অসভ্য বন্ধ

পশুকে ক'রে তুলেছে সুশিক্ষিত, সুদীক্ষিত আর শৃঙ্খলা ও নিয়মের কাঠিতে বেঁধে দিয়েছে এর অলস শিথিল ও স্বপ্নবিলাসী মুহূর্তগুলোকে।

দেখতে দেখতে চকাশার হারিয়ে ফেললো তার নিজের কাঠামো। পুরানো ছন্দ আর সুর ভুলে গেল, নতুন ক'রে বেজে উঠলো তার অনেক দিনের বধির কণ্ঠ।

চকাশারের দিকে চাইলে আজ তাকে আর চেনাই যায় না। বিরাট প্রাসাদ জমকে বসেছে। কুড়ি হাত চওড়া লোহার ফটকে সোণা দিয়ে বড়ো বড়ো বাংলা হরফে লেখা 'সুনন্দা-প্রাসাদ'। বারো ফুট উঁচু পাঁচিল বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করেছে প্রাসাদটিকে। প্রাচীরের ওপর জাল উঠেছে আরো প্রায় পনরো হাত। জাল দেখা যায় না। ঝুমকো-লতা আর বনফুলে মুড়ে দেওয়া। মাত্র ফটক দিয়ে একটু ভগ্নাংশ তার দেখা যায়। তাও যে দেখবে এ সাধ্য কার! মোটা মোটা থামের ওপর ফটকের দুপাশে দুটো সাদা পাথরের সিংহ বসানো। কেশর ফুলিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই পোজ্। তারপর অতিকায় ভোজপুরী দ্বারপালের সতর্ক দৃষ্টি। এই দুটিকে ডিঙিয়ে চট ক'রে কারোর দৃষ্টি ভেতরে পৌঁছাবার সাহসী হয় না।

প্রতি সপ্তাহে শনিবার সুনন্দা-প্রাসাদ সজাগ হয়ে ওঠে! ভোজপুরী দ্বারপালের সাজ পাল্টে যায়! পরনে থাকে জড়ির কাজ-করা উর্দি। হাতে রাইফেল। বুকের পেটিতে থাকে বারোটি গুলি, পরপর সাজানো। বড় বড় গাড়ী গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। ভোজপুরী দ্বার খোলে। একে একে গাড়ীগুলি ভেতরে ঢুকে গেলে ভোজপুরী আবার গেট বন্ধ করে দেয়।

সন্ধে সাতটা থেকে শুরু হয় গেষ্টদের আগমন। শহরের বড়ো বিখ্যাত, স্বনামধন্য মনীষী আছেন, সকলেই সেদিন সমবেত হন এখানে। দলে দলে আসতে শুরু করেন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও বিদগ্ধজনেরা।

আতিথ্য আয়োজনও চলে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা ভিন্ন স্থানে। বিরাট বিরাট মার্বেলের হল-ঘরে লাল, নীল ডুম জ্বালা ঝাড়গুলোতে। বিচিত্র মনে হয় সমস্ত বাড়িটা। যেন একটা আতসবাজী, এখুনি বুঝি বা বিদ্যুৎ-গতিতে শূন্যে উঠে গিয়ে ভেঙ্গে পড়বে শতধারে।

একশো বয় ঝক্‌ঝকে পোষাকে হাতে রূপার ট্রে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নানান রকমের কোল্ডড্রিংক তাতে সাজানো। তার সঙ্গে রয়েছে জিন্ আর কক্‌টেল।

ডিনার শুরু হয় রাত এগারোটায়। ডিনার শেষে মৌমাছিগুলি একে একে মৌচাক থেকে বেরিয়ে গেলে ভোজপুরী দ্বার বন্ধ ক'রে যখন উর্দি খুলে বিশ্রামের আবেশে খাটিয়ায় এলিয়ে পড়ে তখন বাজে সাড়ে দশটা।

মাঠে মাঠে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। লোক খাবে। কোনো মাঠ আর বাদ নেই শহরের। ইমানী-পার্ক থেকে আরম্ভ করে হিন্দ্-বাগ পর্যন্ত। শহরের আশপাশের গ্রাম থেকেও লোক এসেছে। শহরের ও বাইরের নিয়ে হবে প্রায় কুড়ি হাজার।

আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই তার। দলে দলে ভলান্টিয়ার খাটছে সারা রাত। রাস্তায় বাঁশের খোঁটা পোতা হচ্ছে আর দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। স্পেশাল পারমিশন নিয়ে পাবলিক হলিডে ঘোষিত হয়েছে সেদিন। শহরের সব চেয়ে চওড়া এভিনিউটি বাঁশের খোঁটা পুঁতে পুঁতে চার ভাগ ক'রে ফেলা হয়েছে।

প্রত্যেক ম্যারাপের ছোট্ট একটি অংশ নিয়ে ভিয়েন বসেছে। ভাজা-ভুজির গন্ধে ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌দেরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়। বাতাসে একটানা 'বনস্পতির' গন্ধ।

খাবার আইটেম হয়েছে রাজভোগ। মাছেরই আইটেম্‌ চারটে—চপ, ফ্রাই, কালিয়া আর পাথুরী। ছানার তিনটে। একটা যে কাতলা এসেছে তারই ওজন হবে প্রায় তিরিশ সের। মাংসও হচ্ছে। পোলাও আছে!

শহরের প্রত্যেক পাড়ায়, প্রত্যেক অলিগলিতে, প্রত্যেক রোয়াকে চাঞ্চল্য। কথা হয়।

"কি ব্যাপার?"

"বলি সত্যযুগ এসে পড়লো না কি হে?"

"চেতাবনী কি আর ভুল করে হে?"

"ওসব গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপার, এক চুল এদিক ওদিক হবার যো আছে কি?"

"তা বটে, তবে আপশোষ রয়ে গেলো প্লাবনটা আর দেখা হলো না!"

"যাক্‌ বাবা, এ-যাত্রায় মহাপ্রলয়ের হাত থেকে খুব জোর বাঁচা গেল।"

শুধু খাওয়ানো নয়। চার আনা করে বিদায় দেওয়া হলো ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ নির্বিবাদে।

শহরে রানী সুনন্দার নাম আর ধরে না। প্রশংসা-পত্র ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের অজস্র চিঠিতে হরিমোহনের টেবিল ভরে ওঠে। ফোনও আসে অজস্র। রিসিভ করতে হয় হরিমোহনকে।

কেউ বলেন;—"ওঁর মতো উদার ও মহানুভব মহিলা সারা

দেশে আর কটা আছে বলুন? টাকা তো অনেকের থাকে কিন্তু দিল্ থাকা চাই দেবার।"

উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে হরিমোহন জানায়;—"ধন্যবাদ"

আবার ফোন।

"আমি মিঃ ট্যাটাস্ ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে ফোন করেছিলাম। তা, হ্যাঁ, দেখুন ওনাকে ফোনে পাওয়া যাবে কি?"

"না, উনি ইনটারভিউ দেন না কখনো। কিছু মনে করবেন না। জানিয়ে দেবো আপনার কথা ওনাকে। নমস্কার।"

আবার ফোন।

"আমি মিঃ চৌধুরী"। "আমি মিঃ চ্যাটার্জী"। "আমি মিঃ বোস"। হরিমোহন ফাঁপড়ে পড়ে। রিসিভার নামিয়ে রেখে দেয় টেবিলের উপর।

সন্ধের সময় সস্ত্রীক মিঃ সেন এসে হাজির নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে। অতিকষ্টে সিচুয়েশন সামলায় করে হরিমোহন। জানায় রানী সুনন্দা কারোর সংগে দেখা করেন না। ভয়ানক পর্দা। তিনি নিজেই স্বয়ং কখনও কথা বলেন নি, দেখা তো দূরের কথা! তাছাড়া তাঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। প্যারালিসিস্-এ সর্বাংগ বিকৃত হয়ে গেছে। লজ্জায় কাউকে ইনটারভিউ দেন না তিনি। শুয়েই থাকেন চব্বিশ ঘণ্টা!

রাণী সুনন্দা প্যারালিটিক্! রোগে সর্বাঙ্গ তাঁর বিকৃত!

মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেলো শহরে কথাগুলো বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো দ্রুত। নতুন ফ্যাসাদ উপস্থিত।

"আরোগ্য লাভ করুন" "নিরাময় হন" জানিয়ে শত শত চিঠি। হরিমোহনকে জবাব দিতে হবে এ-সবের।

সিভিল সার্জেনদের অযাচিত আগমন। কি হয়েছে তাঁর সঠিক

জানালে সুস্থ করার জন্যে তাঁকে ওঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। অত বড়ো একটা মহান হৃদয়কে এমনি ক'রে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারেন না তাঁরা। উনি দেশের গৌরব, দেশের সম্পদ। উনি বেঁচে থাকলে দেশ অনেক কিছু পাবে ওঁর কাছ থেকে।

হরিমোহনের এবার যেন বিরক্তি এসেছে। সীমা আছে সব কিছুর।

"মাপ করবেন। আমার যতদূর সাধ্য ততদূর আপনাদের নিয়ে যেতে পারি। তার বেশি তো আর পারি না। যা হুকুম তাই জানিয়ে দিয়েছি তো অনেক আগেই।"

শহরের সত্যনারায়ণের মন্দিরে বহুদিন পর হঠাৎ কীর্তনীয়াদের কণ্ঠ আবার বেজে ওঠে। সকাল থেকে তিনচার জন কীর্তনীয়া এসেছে। পনেরো দিন ধরে রোজ সন্ধায় গান হবে।

মন্দিরে সকাল থেকে হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। অসংখ্য অজস্র যাত্রী আসছে দেশ-বিদেশ থেকে! পোঁটলা-পুঁটলি সংগে নিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মতো তারা মন্দিরের কিনারে এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

সকলে অবাক। এও কি কখনো হয়? মন্দিরের গায়ে এক পোঁচ্ রং! ফাটা ফাটা স্থানগুলো অবশ্য তখনও চেনা যাচ্ছে। তবু ভোল্ পালটে গেছে এ-কথা বলতেই হবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

সন্ধের কিছু পরেই দেখা গেল প্রত্যেক যাত্রীর হাতে একটি ক'রে সরা। তাতে একটি ঢাকাই পরটা, দুটি সিঙারা, চারটে আলুর দম, দুটি মিষ্টি। সমস্ত যেন ঘড়ির নিয়মে বাঁধা। অত্যাশ্চর্য বন্দোবস্ত! কোথাও এক তিলও ফাঁক নেই।

আরো চার দল কীর্তনীয়া এসেছে। সকলেই শ্রীজয়দেবের পালা

গাইবে। পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। যে-দল সবচেয়ে ভালো গাইবে সে-দলের মূল গায়েন পাবে গরদের জোড় ও স্বর্ণপদক আর একশো টাকা। অন্য সব গায়েনরা পাবে ধুতি-চাদর আর নগদ পঞ্চাশ টাকা।

সন্ধে হতে না হতেই আজ গ্যাস-লাইট জেলে দেওয়া হলো। কীর্তনীয়াদের কণ্ঠ সত্যনারায়ণের মন্দির-প্রাংগণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে ঘুরে ঘুরে আছড়ে পড়তে লাগলো। বৃষ্টির ভয়ে চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। তার ঘন নীল রঙ অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে। ভোর হয়ে আসে। ছ'টায় পালা গান ভেঙে যায়। লোকেরা বলাবলি করে :

"মাঝিয়ার দল মেরে দিলে বোধ হয়।"

"ধ্যেৎ! মাঝিয়ার চেয়ে কাটোয়ার দল ঢের ভালো গেয়েছে।"

"ত সত্যি, কাটোয়ার দল যা গেয়েছে, ওদিকে বিধবাদের মধ্যে তিনজন প্রায় ফেন্ট।"

রোজ মন্দিরের দ্বারে এসে লাগে একটি আট-সিলিণ্ডার বুইক্। কালো মখমলের আঙরাখা গায়ে দিয়ে একজন মহিলা নেমে আসেন। সমস্ত যেন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ভলান্টিয়াররা ভীড় সামলে এঁকে নিয়ে যাবার জন্য আসে ছুটে। উৎসুক জনতার দৃষ্টি লুটিয়ে পড়ে ওদিকে। কীর্তনীয়ার একাগ্রতাও ঢিলে হয়ে আসে একটু। তাল কেটে যায় কোনো কোনো দিন।

ভলান্টিয়ারদের প্রদর্শিত পথে গজেন্দ্রগমনে তিনি এগিয়ে যান। কালো পুরু মখমলের চাদর থেকে শুধু খস্ খস্ শব্দ হয়। দর্শক আর শ্রোতারা তাই শোনবার জন্য হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে আসতে চায়।

নির্দিষ্ট স্থান থেকে মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত কাপড়ের কাণ্ডার দিয়ে ঘিরে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কিছুদূর থেকেই তা হয়েছে। সেই পর্যন্ত সকলের গতি। ভেতরে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যান তিনি। দু'জন ভলান্টিয়ার

অপেক্ষায় বসে থাকে সেখানে। কোনোদিন পনেরো, কোনোদিন কুড়ি মিনিট, যদি খুব বেশি হয় তো আধঘণ্টা থাকেন তিনি।

মন্দির আজ জমে উঠেছে। মুরবীগঞ্জ কীর্তনীয়ার দল আজ গাইছে। সুরে আর শব্দে ভরিয়ে দিয়েছে দেউলের প্রতিটি প্রস্তর। সকলের চোখে জল। যেন সুরের দুর্বার আকর্ষণে প্রাণের নিরবয়ব ভাবটা বেরিয়ে এসেছে মূর্তিমতী হয়ে। আর এসেই থমকে থেমে আছে। পড়লেই তো সব ফুরিয়ে যাবে।

ভলান্টিয়াররা এবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রায় দেড়ঘণ্টা হলো। তবু কোনো সাড়াশব্দ নেই ভেতর থেকে। গান শেষ হবার সংগে সংগেই মথমলের শব্দ শোনা গেলো ভেতর থেকে। শব্দ যেন একটু দ্রুত আজ। কেমন যেন ছন্দ আছে অথচ কানে বেসুরো লাগে। অনেকটা 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্টত্যগ্রে'র মত।

চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল রানী সুনন্দা আজ দেড়ঘণ্টা ছিলেন মন্দিরে।

"মুরবীগঞ্জ মেরেছে।"

"নিশ্চয়ই" গলায় জোর দিয়ে সকলে বলে;—"নিশ্চয়ই। ও দল পাবে না তো কি পাবে ভাটপাড়ায় আর বটতলায়? বেটাদের সুরই বেরোয় না গলা থেকে।"

এই পনেরো দিনের মধ্যে কিন্তু দু'টি শনিবার বাদ যায়নি। ঠিক তেমনি ক'রেই ভোজপুরীর পোষাক পালটে গেছে। বড়ো বড়ো গাড়ী এসে লেগেছে সুনন্দা-প্রাসাদের ধারে। সমস্ত প্রাসাদটা রঙীন নেশায় লম্পট হয়ে উঠেছে যেন। কিন্তু পার্টি আর তেমন জমে ওঠে না। কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে। ঠিক যেন স্প্রীং-কাটা ঘড়ির মতো।

শহরে নানান কথা উঠেছে। রানী সুনন্দা কে? কোথাকার রানী? কি তাঁর পরিচয়? কেউ তাঁকে আজ পর্যন্ত দেখতে পায় নি। এই বিংশ শতাব্দীর প্রগতির হাওয়ায় কেন তিনি এত পর্দানসীন? অজস্র প্রশংসার পেছনে এই প্রশ্নগুলো জেগে থাকে কিউ. ই. ডি. র মতো।

মিঃ সেন কাগজে খুব জোর লিখেছেন। তাই নিয়ে আজ হৈ চৈ। হরিমোহন তাঁকে বলেছিলেন তিনি প্যারালিটিক। শুয়েই থাকেন চব্বিশ ঘণ্টা। কীর্তন শুনতে তো তাঁর যাওয়া চলে! সুতীব্র বিদ্রূপের সংগে তিনি দু-একটা মন্তব্য করেছেন।

সেনের কাছে চিঠির পর চিঠি। ফিরিয়ে নিতে হবে তাঁর লেখা। সকলের সামনে তাঁকে মাপ চাইতে হবে। বিশেষ ক'রে কলেজের ছেলেরা খেপেছে।

বিকাশ দীপ্ত কণ্ঠে বলে;—"আপনার এ লেখা প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে হবে।"

"বাট, বাট হোয়াট আই হ্যাভ রিটন ইজ ট্রু।"

"আপনার এ লেখা ফেরৎ নিতে হবে।" ছেলেদের সেই এক দাবী।

জলস্রোতের মতো ছেলেরা এসে থামছে সেনের বাড়ির সামনে। সেন ঘাবড়ে যান এবার। ক্ষমা চান। লেখা ফেরৎ নেন। তবুও বলেন;—"বাট, বাট হোয়াট আই হ্যাভ রিটন্ ইজ ট্রু।"

হরিমোহন ফাঁপড়ে পড়েছে এবার। মেয়েদের কলেজ থেকে ওভেশান দেওয়া হবে রানী সুনন্দা দেবীকে। মংগলবার পাঁচটায় হেডমিষ্ট্রেস সশরীরে আসবেন বলেছেন। হরিমোহন কাঁধের চাদরটা গায়ে দিতে দিতে একটু ভিতরে গা ঢাকা দেয়। হেডমিষ্ট্রেস আসেন।

ডাকা-হাঁকির পর কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তাই নিয়ে কাগজে কমেণ্ট। মিঃ সেন যেন থৈ পান অকূল পাথারে।

ধোঁয়া ছড়িয়েছে শহরে। রানী সুনন্দা অসূর্যম্পশ্যা। ভদ্র ও উন্নত ঘরের মহিলারাও তাঁর দর্শন পান না।

যা করে ঐ নুয়ে-পড়া পঞ্চান্ন বছরের হরিমোহন। গায়ে থাকে সর্বদা আশমানী রঙের গলাবন্ধ কোট আর গলায় আধময়লা চাদর।

ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ নিয়ে একদিন গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দু'দলই তৈরী। কলেজ ছুটি হলেই হয়।

সামান্য কথাতেই আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। মতভেদ শুধু, আর কিছু নয়। এক দলের অভিমত, পয়সা বেশি হলে সকলেরই ঐ রকম একটা কিছু এক্‌সেনট্রিসিটি থাকে। তাই নিয়ে তাকে বিদ্রূপ করা সংগত নয়। এই যে শহরে ক'দিন ধরে এতো কাজ হলো এর জন্যে যদি শহর তার এটুকু উগ্রতা না সইতে পারে তো শহরের কম অপমানের কথা নয়।

অপর দলের মত, অভদ্রতাকে অভদ্রতা বলতে কখনো কারোর পিছপাও হওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ হরিমোহন এসে উপস্থিত কলেজে। ছেলেদের দ্বন্দ্ব ধূলিসাৎ হলো মুহূর্তে। মিটমাট হয়ে গেল সব। রানী সুনন্দা বলে পাঠিয়েছেন ছেলে ও মেয়েদের কাছ থেকে তিনি ক্ষমা চান। তাঁদের বংশে কোনো কারুর বেরোনো নিষেধ আছে। আর মন্দিরে তিনি যান নি। গিয়েছিলো তার খুব দূরসম্পর্কের একজন।

দু'দলই শান্ত হয়।

পুরন্দরকে সুপুরুষ বললেও তার রূপের প্রশংসা করা হয় না।

রূপের আধিক্যে নারী-স্বভাব-সুলভ ভীরুতা এসে জমে সকল ক্ষেত্রে। কিন্তু পুরন্দরের শরীরে তার শতাংশের এক ভাগও নেই। পাৎলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন তার; তবু বলিষ্ঠ পৌরুষ আছে তাতে। বয়েস তার তিরিশের কাছাকাছি।

অণিমা, তরু, ইলা, আভা পর পর আরো অনেক নাম করা যেতে পারে যারা পুরন্দরকে ভালোবেসেছিলো। এইতো সেদিন পর্যন্ত সাড়া তাকে চিঠি পাঠিয়েছে—ফুলস্কেপ কাগজের চার পাতা চিঠি। কিন্তু পুরন্দর অনড় অটল। ব্যর্থ হয়ে তারা সরে গেছে দূরে। চার চারটে ড্রয়ার-ভর্তি চিঠিগুলো এখনো সে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে কোনো কোনোদিন। মাঝে মাঝে নিদারুণ একটা হতাশ্বাস চেপে ধরে তাকে।

এ হতাশ্বাস অন্য কিছুর নয়। সে ভাবে, পৃথিবীটা কি এতই ছোটো যে নিজের পছন্দমতো একটি মুখও সে দেখতে পাবে না!

বন্ধুদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে এসে হঠাৎ আজ তার মনে পড়ে যায় অতীতের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনাগুলো। বন্ধুমহলে এটা অবশ্য তার গর্বের। এতগুলো স্ফুটনোন্মুখ কুমারী অন্তরের সংস্পর্শে এসেছে সে, পেয়েছে তাদের নিবিড় সান্নিধ্য, তবু তাকে কেউ বাঁধতে পারেনি। কিন্তু আজ অকারণে পুরন্দরের মনে হয় কোথায় যেন আট্‌কা পড়লে ছিলো ভালো।

প্রথমেই তার মনে পড়লো মিলির কথা। মিলিরা এখন আছে বম্বেতে। ঠিকানাও রয়েছে তার কাছে। গেলে মিলি খুশিই হবে।

মিলির সঙ্গে ছ'মাস দেখাশুনা নেই। তার সঙ্গে কি কথা কইবে মনে মনে তা এঁচে নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি অন্ধকার গলির মোড়ে এসে পৌছলো সে। বাঁক ঘুরতেই কারা সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো

তার ওপর। চোখ মুখ বেঁধে দিলো। ধরাধরি ক'রে তারপর ওকে তুললো-ট্যাক্সিতে।

পুরন্দর বাধা দিলো না। মনে হলো তার, এরা যেন তার মূর্তিমান ভবিতব্য। এতোদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ছায়ার মতো ওরা পাশে পাশে ছিলো। আজ এই অন্ধকারে নির্জনে পেয়ে হঠাৎ মূর্ত হয়ে তাকে আবার কোন অভাবিত নতুন জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটি হাত তুলে বাধাও দিলো না সে।

ধরাধরি করে নামিয়ে বয়ে এনে যেখানে তাকে ওরা বসিয়ে রেখে গেলো পুরন্দর মাটির মতো সেখানে রইলো বসে। চোখ খুলে শুধু বিস্মিত হলো একটু। সুমার্জিত প্রকাণ্ড ঘর। দামী কার্পেটে ফ্লোর মোড়া। দেয়ালের গায়ে অজন্তা ও ইলোরার কাজ। পরিপূর্ণ দক্ষতার সংগে আঁকা। অলিন্দে প্রাচীন পুরাকীর্তির প্রতিচ্ছবি। ঘরের এককোণে গ্র্যাণ্ড ক্লক, সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। সোনার দুটি কাঁটাতে হীরে সেট করা। লম্বা মেহগ্নির টেবিলের ওপর অনেক তিব্বতি কিউরিও।

হঠাৎ আলো নিভে গেলো একরাশ অন্ধকারের পাঁক ছিটিয়ে। খস্ খস্ শব্দ হলো ঘরে। পুরন্দর ভয় পেলো না। শুধু তার মনে জেগে রইলো একটা উৎকণ্ঠা।

আলো আবার জ্বলে উঠলো, নীল আলো। অস্পষ্ট কুয়াসার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলো পুরন্দর তার অনতিদূরে কালো মখমলের আংরাখা প'রে কে যেন বসে।

কে? বিস্ময়ের জ্বালাময়ী একটা ক্ষণপ্রভা হৃদয়ের সমস্ত আকাশ চিরে একবার চমকে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। কীর্তনের দিনে মন্দিরের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একে সে দেখেছে।

চোখের জড়তা কাটিয়ে আবার দেখতে চেষ্টা করে সে। অনেক সমুদ্র সাঁতরে প্রবাল দ্বীপের ভেতর আঁকা কোনো মূর্তির মতো মনে হয় ওকে। হ্যাঁ। ঐ তো বসে আংরাখা-ঢাকা সেই নারী!

পুরন্দর বোঝে সে সুনন্দা-প্রাসাদে। তার সামনে রানী সুনন্দা।

পথে যেতে যেতে দু-একজন লোকের একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হয় সুনন্দা-প্রাসাদটীকে। উত্তর দিক থেকে মিহি আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে। অস্বাভাবিক বৈকি! শনিবার ছাড়া কোনো আলো জ্বলতে এখানে কেউ কখনো দেখেনি। সমস্ত প্রাসাদটা যেন অন্ধকারের দীর্ঘ দীর্ঘ জটা প'রে সপ্তাহের বাকী ছটা দিন কোনো প্রাগৈতিহাসিক ঋষির মতো গভীর সমাধিতে ডুবে থাকে।

রাত দুটো। তখনো সিল্ক-মোড়া গদির ওপর পুরন্দর ব'সে। পশমের মতো কোমল একটি কৌতূহল পুরন্দরকে তাক্ত করছে। আর অসংখ্য প্রশ্ন ভীড় করছে মনে। ছোট ছোট পাখীর মতো তার প্রশ্নগুলি। পূর্বের রক্তপলাশ তীরের দিকে উড়ে যাবার জন্য উন্মুখ। উৎকণ্ঠা আর নেই। শুধু শান্ত উত্তেজনা।

খস্ খস্ শব্দ হয়। হাল্কা হাওয়ার মতো ফিন্‌ফিনে আওয়াজ। ঘরে নীল আলো জ্বালা।

পুরন্দর ঘাড় ঘোরালো। সাদা সিল্কের আংরাখায় পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ঢাকা। কুয়াসার মতো একটা পর্দা শুধু রেখেছে দুজনকে আড়াল ক'রে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে তার সঙ্গিনীর প্রতিটি অবয়ব। কোটী কোটী রেশমী সুতোর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুনুনির মধ্যে দিয়ে চাঁপার মতো তার রঙ তীরের ফলার মতো বেরিয়ে এসে পুরন্দরের চোখে ধাঁধা লাগায়।

রানী সুনন্দা যুবতী!!

মৌমাছির কামড়ের মতো তীক্ষ্ণ একটা জ্বালা গুণছিন্ন ধনুকের মতো পুরন্দরকে সজাগ করে তোলে। রগ দুটো দপ দপ করে ওঠে একবার।

রানী সুনন্দা এগিয়ে এসেছে আরো কাছে। আরো সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে তার অভিসারিকার সুস্থ সুডৌল দেহ; পাকে পাকে যার জড়িয়ে আছে বলিষ্ঠ ভাস্বর যৌবন, ভাঁজে ভাঁজে যার অন্তহীন বিরাট সমুদ্র জমে নিস্তব্ধ পাথরের মতো ঘুমিয়ে রয়েছে। তার হাতের একটু স্পর্শ পেলেই গলে গিয়ে ভাসিয়ে দেবে তার সমস্ত পৃথিবীকে।

পুরন্দরের চোখে লাগে মাদকতা। মনে লাগে গভীর কোন্ অরণ্যের স্বাদ। তারা-দেখা লোভ আর পাহাড়-নোয়ানো আকাঙ্খা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পুরন্দর আজ তলিয়ে গেলো।

যৌবনের সুধারসে স্নাতস্নিগ্ধ রানী সুনন্দার দুগ্ধফেননিভ দেহকে স্পর্শে স্পর্শে পুরন্দর তন্ন তন্ন করে চিনে ফেলেছে।

খোলা ছাদের হাওয়ায় পুরন্দর উঠে আসে। আজ রবিবার। নিচেকার ঘরে ব্রীজ জমে উঠেছে। বিকেল হতে আর দেরী নেই। সুনন্দার কাছে যেতে হবে।

সকলে আজকাল সন্দেহ করে ওকে, আশ্চর্য নয়। সে যেনো রাতারাতি পালটে সম্পূর্ণ অন্য লোক হয়ে গেছে।

শহরের আবহাওয়াও অনেক পালটে গেছে। শনিবার শনিবার সুনন্দা-প্রাসাদ আর জমকে ওঠে না। ভোজপুরীর সাজ একঘেয়েই থাকে। লোহার ফটক খোলা হয় না কখনো। লোহার রিভেটে মরচে পড়ে।

সুনন্দা-প্রাসাদের আভিজাত্য ম্লান হয়ে এসেছে। ঝরণার মুখ শুকিয়ে গেছে ঠিক এমনি একটি বিষণ্ণ রিক্ততা। পাঁচিলের ওপর জালে অনেক জায়গায় ঝুমকোলতা আর বুনোফুল খসে পড়ে গেছে।

যেখানে সেখানে আর কারণে অকারণে কথা ওঠে না রানী সুনন্দাকে নিয়ে। যদিই বা ওঠে তো দু-এক জন একটি ছোট্ট মন্তব্য করে যায়। যেনো, এতোদিন ধরে যা হলো তা কিছুই নয়। অনর্থক শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। এর চেয়ে কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে কিছু গ্র্যাণ্ট দিলে ঢের উপকার হতো।

পুরন্দরের রাগে গা কাঁপে। নিশ্চয়ই! তা হলে ঐ গ্র্যাণ্ট থেকে ওদের মত কত লোক যে আজীবন বেশ কিছু গুছিয়ে নিতো! দাঁতে দাঁত চেপে সে-স্থান ছেড়ে সে চলে যায়।

পুরন্দরের বন্ধুরাও আজকাল পুরন্দরকে খোঁটা দিয়ে কথা কয়।

"ওর কি আর এখন সময় আছে রে?"

"এখুনি ওর গাড়ী আসবে কোথায় কোন্ পার্কের ধারে।"

ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে ওঠে পুরন্দর। তাকে ফলো ক'রে ওরা জেনেছে যে তার জন্যে গাড়ী পাঠায় কেউ।

"ওর যা চেহারা!" ব'লে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে কেউ।

আজকাল এসবে পুরন্দরের আর কিছুই এসে যায় না। গভীর রাতে একদিন ঘুম থেকে উঠে বসে সে। সুনন্দার উষ্ণ উপস্থিতি বুঝতে পারে পাশে। গভীর প্রশান্তিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সুনন্দা। গুটি মেরে খাট থেকে নামে নিচে। জানালার কাছে এগিয়ে যায়।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সারা পৃথিবীতে অদ্ভুত স্তব্ধতা। আকাশে হাজার হাজার তারার ঝুমকো ঝুলছে।

নিজের দিকে পুরন্দর চোখ মেলে ভালো ক'রে চাইতে প্রথম অবকাশ পেলো আজ। চিরকালই তার স্বভাব ভিক্ষে ক'রে কেঁদে-ককিয়ে কোনো জিনিস সে নেবে না। এমন কি তার প্রাপ্যও না। সে

মনে করে যা তার পাবার তা তার কাছে আসবে স্বতই। যার জন্যে পরিশ্রম তা তার নয়, তা অপরের। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাকে নির্মমভাবে হেরে যেতে হয়েছে তার এ উদ্ভট খামখেয়ালিতার জন্যে। তবু সে টলে নি কোনোদিন।

মিলিকে তার আবার মনে পড়লো। কিন্তু ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট সে। সাড়া যে আজ চলে গেছে, অনুপমা যে আজ পৃথিবী থেকে নিজেকে মুছে ফেলেছে, ইভা যে বানের মুখে কুটোর মতো ভেসে গেছে সে জানে সবই তার জন্যে। আজ আর মনে এলো না কোনো দুঃখ, কোনো অনুশোচনা।

সমস্ত মন হাতড়ে কারোর কোনো নোঙরের চিহ্ন পেলো না সে। মিলিই শুধু একমাত্র এ প্লাবনের মাঝখানে খড়কুটোর মতো পলিমাটির ওপর আটকে রয়েছে। তাও আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে। পরিপূর্ণ সে আজ। অতীতের কোনো স্মৃতিই আজ তার অন্তরে ঘা দিতে পারবে না।

জানালার কাছ থেকে সরে আসে পুরন্দর। ফুলের পাপড়ির মতো সুনন্দার কোমল দেহ-বল্লরী টেনে নেয় কাছে।

ঘুমের ঘোরে সুনন্দা শুধু বলে ;—"উঁ!"

দিনের পর দিন চলে যায়। ভোজপুরী ও কেশর-ফোলানো সিংহ দুটো গা-সওয়া হয়ে গেছে। দলে দলে লোক আর বিনা কাজে সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় না প্রাসাদ দেখার জন্যে। এখন কদাচিৎ দু-একটি লোক পায়ে হেঁটে যায়। তাও খুব কাজ না থাকলে নয়। এমন দৃষ্টি দিয়ে তাকায় প্রাসাদের দিকে যেনো প্রকাণ্ড একটা রহস্য রয়েছে ওর মধ্যে যার উন্মেষ শহরের হৃৎপিণ্ডকে দেবে চমকে। কেনো

যে সন্দেহ, কি যে সন্দেহ তা তারা জানে না। তবু অকারণে তাদের গা ছম্ ছম্ করে প্রাসাদের এলাকার মধ্যে এলেই।

বাইরে রানী সুনন্দা শুকিয়ে এসেছে বটে কিন্তু পুরন্দর আজো তার খেই পায়নি। একটা জীবন্ত প্রহেলিকার মতো সে জেগে আছে ওর জীবনে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর যেনো রাতের পর রাত এক দীর্ঘ অলীক স্বপ্ন দেখে চলেছে সে। যেন এক কুয়াসাময় অবাস্তব জগতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে! ঘাটে ঘাটে যার দিক-জোড়া বিস্ময়, পায়ে পায়ে যার অফুরান আনন্দ, মাঠে মাঠে যার অদ্ভুত ছায়াদের জনতা!

সুনন্দাকে এই কদিন ধরে একটু বিমনা লাগে। পুরন্দরের বুঝতে দেরী হয় না কোথায় যেনো কী হয়েছে। বলে ;—"নন্দা, আমায় বাড়ি যেতে হবে ছুটিতে। ভাবছি কালই যাবো।"

"কেন?" সুনন্দার কণ্ঠ বন-বেতসের মতো কাঁপে।

পুরন্দরের ভুল হয়েছে না কি? আরো কঠিন হতে চেষ্টা করে ;— "নন্দা আমায় যেতেই হবে। বহু দিন যাইনি।"

বর্ষণোন্মুখ মেঘ এতোদিনে শুরু করলো তার বর্ষণ।

পুরন্দর নিজের ভুল বুঝতে পারে। ডাকে ;—"নন্দা!"

সুনন্দার চোখে তখনো মেঘ। তখনো মনে রুদ্ধ আবেগ।

"নন্দা!"

নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুকে চাপা চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

"আমায় ক্ষমা করো নন্দা!"

সুনন্দার একখানি হাত পুরন্দরের গায়ে এসে লাগে।

"আমায় ক্ষমা করো নন্দা। আমি তোমায় বুঝতে পারিনি।"

সুনন্দা পুরন্দরের কাছে সরে এসে গা ঘেঁসে বসে।

"আমায় ক্ষমা"—

মুখ চেপে ধরে সুনন্দা তার হাত দিয়ে। কোনো কথা বলে না। খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক হাওয়ায় সুনন্দার অবিন্যস্ত চুলগুলি তার মুখে চোখে উড়ে পড়ে।

ছোট্ট চিঠি।

তোমার জন্যে গাড়ি পাঠাবো ইমানী পার্কের ধারে। এসো। ইতি। তোমার নন্দা।

ইমানী পার্কের ধারে এসে পুরন্দর হাত মুঠো করে। ক্রমে ক্রমে নিজের অজ্ঞাতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে সে। সুনন্দাকে সে আজ পর্যন্ত দেখে নি আলোয়। অন্ধকারের কোটরেই শুধু ওকে সে দেখেছে, চিনেছে, বুঝেছে।

যতোবার এই নিয়ে কোন কথা সে বলতে গেছে সুনন্দাকে, সে যেনো তার কাছে হয়ে উঠেছে আরো রহস্যময়ী। কথার পর কথা দিয়ে সৃষ্টি করেছে এমনি এক ইন্দ্রজাল যে পুরন্দরের সতর্ক পাখনা দুটি আটকে গেছে তাতে। অবশ, বিবশ হয়ে সে ভেসে গেছে হাওয়ার সমুদ্রে।

পুরন্দর আজ মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো।

সুনন্দা রাজি হয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় সে দেখা দেবে পুরন্দরকে। পুরন্দর আশ্চর্য হলো একটু।

"এবার তাহলে আলো জ্বালি ?"

—"এখন নয়।" সুনন্দা বলে ;—"আমি তো রয়েছি এখানে।"

সুনন্দা পুরন্দরের কাছে স'রে আসে।

সেই ইন্দ্রজাল রচনা শুরু হয়েছে। রেশমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতোর মতো একটা মসৃণ আবেগের আবেষ্টনে যেন সে মুছে যাচ্ছে। পুরন্দর তবু টলবে না।

"আলো জ্বালি তা হলে ?" একটু থেমে পুরন্দর আবার বলে ;—"জ্বালি কেমন ?"

"উঁহু !"

পুরন্দরের গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে সুনন্দা। সুনন্দা বলে ;—"ধরো যদি আমরা চলে যাই অনেক দূরে, দেশ বিদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে, যেখানে কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।"

পুরন্দরের আটকে-যাওয়া পাখনা শুধু ঝটাপটি করে ব্যর্থতায়।

"শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। দিন-রাত সেখানে মুছে যাবে, সময় সেখানে থেমে যাবে, মুখোমুখি শুধু আমরা থাকবো এমনি করে।"

পুরন্দরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে। প্রশ্ন ক'রে জানবার, দৃষ্টি দিয়ে দেহের কৌতূহল মেটাবার আর কোন আকাঙ্খাই নেই তার।

কতোবার কূলে উঠতে চেয়েছে পুরন্দর। কিন্তু সে প্রতিবারই বিপন্ন নাবিকের মত হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক। পরক্ষণেই সে নিজেকে আবার সামলে নিয়েছে।

সুনন্দার গাড়ীকে আজ নিয়ে সে ফিরিয়ে দিয়েছে তিন বার। গাছের পাতার ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। পুরন্দর তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

বিকেলের দিকে ছোট্ট চিরকুট হাতে এলো। ভিখারীর ছোট ছেলেটা দিয়ে গেল। কে তাকে দিয়ে গেছে• পুরন্দরকে দিতে হবে বলে। ছোট্ট চিঠি।

'গত তিন দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি। দেখো আর যা করো সইবে, কিন্তু তোমার এ-অবহেলা সইতে পারি না।'

নটায় তোমার জন্যে গাড়ী পাঠাবো ফরাস পুকুরের কাছে। এসো।
ইতি। তোমার নন্দা।'

পুরন্দরের মুখ শক্ত হয়ে আসে। অদৃশ্য তার দিয়ে কে যেন তাকে টানছে। কিছুতেই কোন প্রকারে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না সে। ঢিলে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে উর্ধশ্বাসে নেমে পড়ে রাস্তায়।

সুনন্দা ধরাগলায় বলে ;—"এ ক'দিন তুমি আসোনি, বুকের মধ্যে কি আর কিছু আছে ? সব গুঁড়ো হয়ে গেছে।"

পুরন্দর নিভে আসছে জ্বলন্ত নীহারিকার মত।

"কেন আসনি ?"

পুরন্দর সম্পূর্ণ নিভে গেছে এতক্ষণে। কোন উষ্ণতা নেই তার শরীরে।

"বলো আর কোনোদিন আমায় এ ভাবে কষ্ট দেবে না ?"

"না !"

"বলো আমি ডেকে পাঠানো মাত্রই চলে আসবে ?"

"হ্যা !"

পুরন্দর যেন দম-দেওয়া কলের পুতুল।

ভেসে ভেসে আজ পুরন্দর যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানকার বাইরের পৃথিবী সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ, কিন্তু তার ভেতরকার পৃথিবীর বিস্তার যে কত দিগন্তকে আড়াল ক'রে দাঁড়াতে পারে, তার হদিস পায় নি পুরন্দর এখনো। পাবে যে কোনোদিন এ-ভরসাও তার নেই। সেখানে যে-সূর্য ওঠে আর যে-চাঁদ অস্ত যায়, যে-ফুল ফোটে আর যে-পাখী ডাকে, ছেঁড়া-ছেঁড়া যে-মেঘগুলো আকাশে গা এলিয়ে দিয়ে অকারণ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তারা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী !

পুরন্দর অসহ্য হয়ে উঠেছে তার বাড়িতে। কোথায় যায়? কি করে? সারারাত কোথায় থাকে?

সেদিন সামান্য কারণে পুরন্দর তার দাদাকে অপমান করেছে। এই পুরন্দর দু'বছর আগেও কোনোদিন তার দাদার ওপর কথা কয় নি। স্পষ্টই সে শুনিয়ে দিয়েছে, 'এ বাড়ির অর্ধেকের মালিক সে। তার ইচ্ছার পথে কণ্টক হয়ে যে দাঁড়াবে তার সম্মান সে রাখতে পারবে না। সে যে কেউই হোক।'

পুরন্দরকে বোঝাতে গিয়ে সমর মুস্কিলে পড়ে। পুরন্দরের মনে যে এতো কল্পনা, এতো কাব্য তা তো সে জানতো না। কলেজের নিতান্ত বেহায়া আর বকাটে ছেলে সেই পুরন্দর কি করে যে কবিতা লিখেছে এইটেই তার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য ঠেকে।

তারপর শুধু কবিতা হলেও কথা ছিলো। এ যে প্রেমের কবিতা! আশ্চর্য! নিবিড় উপলব্ধির বিপুল আনন্দে সেগুলো যেনো ভাষার সীমাবদ্ধ সমস্ত শৃংখল ভেঙে প্রাণ পেতে চাইছে গভীর ব্যাকুলতায় উপদেশ দিতে গিয়ে স্তব্ধ মূক হয়ে গেছে সমর।

পুরন্দর নিতান্ত একা পড়ে গেছে। কেউ নেই তার কাছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সকলের মুখ এখন কুঁকড়ে ওঠে পুরন্দরের নাম শুনলে। তার ঘরে ব্রীজ আড্ডা উঠে গেছে বহুদিন। কেউ তার ঘরেও আর ঢোকে না কেউ তার সংবাদও নেয় না। সারাদিন সে তার ঘরে একাই থাকে কি যে করে সেই জানে। সন্ধ্যের কিছু আগে বেরিয়ে পড়ে সুনন্দা-প্রাসাদের দিকে বেড়াতে যায়। রাত হলেই পেছনের গে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। শুধু শেষ ক'দিন সমর তার খুব পেটো

হয়ে উঠেছিলো। সারাটাদিন পুরন্দরের কাছে কাছেই থাকতো। ভাবতো। এমন অভিসারিকা এ জীবনে মেলে ?

পুরন্দর তাঁর কোন প্রশ্নের জবাব দিত না। শুধু হাসতো, পরিপূর্ণ জীবনের প্রাণভরা আশ্চর্য হাসি !!

সমর এ-হাসি দেখেও অবাক হয়! পুরন্দরের শরীরেও লাবণ্য শতগুণ বেড়ে উঠেছে !

কিছুদিন পর সমরকে চলে যেতে হয়েছে পুরন্দরকে একলা রেখে বেলঘোরে তাদের তেলের কারবার দেখতে।

একা থাকলেও পুরন্দর কিন্তু আগের চেয়ে হয়েছে আরো স্ফূর্তিমান। বিষণ্ণতার ক্ষীণতম আভাও তার মুখে প্রতিভাত হতে কেউ দেখে না। ছোট-খাটো দৈনন্দিন পরাজয়কে সে আজকাল আরো তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেয়।

রানী সুনন্দাকে সে আর দেখতে চায় না উজ্জ্বল আলোয়। দৃষ্টি দিয়ে দেখার সমস্ত প্রয়োজন তার মিটে গেছে। কি হবে দেখে? দেখলেই তো সংকুচিত হয়ে রানী সুনন্দা ধরা দেবে ছোট্ট একটি মানুষীর দেহে! কল্পনার এ-উন্মাদ প্রসারতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। প্রেমের এই আকাশ-ছোঁয়া অতলতা আর থাকবে না! বেশ আছে পুরন্দর।

শহরে শহরে আজ বিরাট চাঞ্চল্য। এতোদিন পরে বিখ্যাত গ্যাঙটির সন্ধান পাওয়া গেছে। রাত তিনটে থেকে সুনন্দা-প্রাসাদ পুলিসে ঘেরা। গ্যাঙের সকলে ধরা প'ড়েছে। এমন কি মহম্মদ খাঁ-ও। কেবল রানী সুনন্দাকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাসাদের প্রত্যেকটি ঘর এখনো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে।

কেষ্ট-বোষ্টমের চায়ের দোকানে কাল রাতে কে একজন ঘুমিয়ে ছিলো। সে খবর দিয়েছে রাত দেড়টার সময় একটা ট্যাক্সি ঢুকেছিলো প্রাসাদে।

ট্যাক্সি!

ষ্টেশনে ষ্টেশনে তখুনি ফোন করে দেওয়া হয়েছে। দুশো মাইল পর্যন্ত যতগুলো ষ্টেশন পড়ে সবগুলোতে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে।

ইন্সপেক্টরদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রানী সুনন্দাকে পাওয়া যাবে। এখনো সে দুশো মাইলের মধ্যে কোথাও না কোথাও রয়েছে।

শহরের সমস্ত ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের ডেকে আনা হয়েছে। সার বেঁধে তারা দাঁড়িয়েছে। টহলের পুলিসরাও বাদ যায়নি। তারাও ভীত বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্ত দুপুর ধরে জেরা করেও মহম্মদ খাঁর কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না রানী সুনন্দা সম্বন্ধে। প্রলোভন দেখানো হলো তাকে নগদ দশ হাজার টাকার নোট সামনে রেখে। মহম্মদের মুখে কিন্তু কোন রেখাও ফুটে উঠলো না। পনেরো হাজার পর্যন্ত লোভ দেখানো হলো তাকে। কিন্তু কোনো কিছুই সে বললো না! শেষে ধাপে ধাপে নেমে টরচারের শেষ সোপানে এসে তার মুখ খুললো।

সে বললো;—"আমার নাম মহম্মদ নয়। আমি কাশ্মীরী মুসলমান নই। আমি বাঙালী। আমার নাম পুরন্দর।"

প্রথমে পরিষ্কার বাংলা শুনে অনেকে বিস্মিত হয়। কিন্তু তাও মুহূর্তের জন্যে। ওদের নানারকম ভাষা শিখে রাখতে হয়। বাংলা মুলুকে যে আসবে, অমন সাফ্ বাংলা না শিখলে চলে? ভাষা নয়

পাল্‌টাতে পারে, কিন্তু চেহারা যাবে কোথায়? ধরা প'ড়ে গেছে মহম্মদ। কোন কৌশলই আর তার খাটবে না।

ছ'জন পুলিসে রুলের বাড়ি তাকে মেরেছে অবিরাম। শেষে তার হতচেতন দেহটাকে টেনে কারাগারের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে।

গম্ভীর রাতে পুরন্দরের চেতনা ফিরে আসে। পুরন্দর জানতো তার এ-স্বপ্ন ভেঙে যাবে, কিন্তু এমন নির্মমভাবে, এমন কঠোরভাবে যে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

গত রাতের সমস্ত ঘটনা আর একবার পর পর ভাববার চেষ্টা করে সে। আজ সে আসতে চায়নি। চিঠি লিখে সুনন্দা তাকে আজ এনেছে প্রাসাদে। চিঠিটা তখনো তার কাছে।

কদিন থেকেই একটু অস্বাভাবিক লাগছিলো তার সুনন্দাকে। রাত্রে মাঝে মাঝে অন্ধকারের মধ্যে যেন বহুলোকের পদশব্দ শুনতে পেত সে। মাঝে মাঝে হাতড়ে সুনন্দাকেও পাশে পেত না।

পুরন্দর ইচ্ছে করেই কোনো প্রশ্ন করেনি। কতবার মনে হয়েছে তার, ঠোঁটের কাছে প্রশ্নগুলো ভীড় করে এসেছে। কিন্তু জোর করে সে তাদের দাবিয়ে দিয়েছে নিচে।

মাঝে মাঝে অন্ধকারে সুনন্দার হাত ধরে কথা কইতে কইতে বুঝেছে আর একখানি হাত ধরিয়ে দিয়ে সুনন্দা কোথায় চলে গেছে। পুরন্দর সারা রাত তাকে নিয়ে থেকেও মনের আকুলতা মনেই চেপে রেখেছে! ভোরে আবার পদশব্দ শুনেছে, সুনন্দা কাছে এসেছে, হাতখানি তার অজ্ঞাতসারে পাল্‌টে গেছে।

মনে মনে হেসেছে পুরন্দর!! সুনন্দা তাকে এত বোকা ভাবে?

কিন্তু সুনন্দা তাকে আজ এ কি করলে? সে ত আজ আসতে চায়নি। জোর করে গাড়ী পাঠিয়ে আজ আনা হয়েছে তাকে।

ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই খুট্ একটি শব্দ। পুরন্দর বোঝে দ্বারে তালাচাবি পড়লো। পরক্ষণেই সুনন্দা কোথায় হাওয়ার মত মিলিয়ে গেলো। যাবার সময় শুধু একবার জড়ালো। হয়তো কাঁদলো খানিকটা।

তারপর পুরন্দর প্রাত্যহিক অভ্যাসের মত ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ রাত দুটো থেকে প্রাসাদে সার্চ !!

কেন তাকে আজ সুনন্দা আসতে বললো ? কেন ? কেন ? কেন ? হঠাৎ পুরন্দরের দু চোখ ভরে এলো অসহায় অশ্রুতে।

সুনন্দা গ্যাঙস্ট্রেস !! দুম্ করে হাতুড়ির এক ঘা পড়লো যেনো মাথায়। চোখের শিরা-উপশিরাগুলো রক্তে এলো ঠেলে।

রাত গভীর। ছেঁড়া একটি কম্বলের ওপর সে শুয়ে আছে। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। পাশ ফিরবার সাধ্যও নেই। পাশের ওপরকার জানালা দিয়ে অবিরাম ঠাণ্ডা হিমের মতো কন্‌কনে হাওয়া এসে ঢুকছে ঘরে। গায়ে মাত্র তার সাদা একটা গেঞ্জী। তবুও শীত করছে না তার। কড়িকাটের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করে সে।

পুরন্দরের কাছে রানী সুনন্দা আজ আর কেনো বিশেষ নারী নয়। ছলনাময়ী প্রবঞ্চক নারীর প্রতীক যেন সে। আদি যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত সেই নারী এমনি ক'রে পাকে পাকে পুরুষকে জড়িয়ে তার সমস্ত স্বাদ শুষে নিয়ে আবার ছায়ার মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে।

স্থির জানে পুরন্দর রানী সুনন্দা কখনো কোথাও ধরা প'ড়বে না।

বাঁকিপুরে সুবোধ

সুবোধ বাঁকিপুর আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশনে ট্রেন থামিতেই ছোট সুটকেশটি হাতে করিয়া সে নামিয়া পড়িল। এসিস্টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টার অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি সুবোধকে দেখিয়া আগাইয়া আসিলেন। কহিলেন, "আরে, সুবোধবাবু যে, এতদিন পর কি মনে কোরে?"

দীর্ঘ বারো বছর পর সুবোধ আজ বাঁকিপুর আসিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া যখন সে চলিয়া গিয়াছিল তখন তাহার বয়স চব্বিশ, তখন সে এম. এ পাশ করিয়াছে। চাকুরী খুঁজিতেছিল। এখন সে শহরের একটি খ্যাতনামা কলেজের প্রফেসার।

বাঁকিপুরকে সেমি-টাউন বলাই ঠিক। শহরের অনেক সুবিধা এখানে মিলে। ইহার পার্শ্ব দিয়া অতসীনদী বহিয়া গিয়াছে। তাহার ওপারে বাঁকিপুর গ্রাম। এই গ্রামে তাহাদের আদি বাড়ি। দীর্ঘ বারো বছর পর আজ সে বাড়ি ফিরিতেছে।

এসিস্টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টারের কথার উত্তরে সুবোধ হাসিয়া বলিল, "কেন আস্‌তে নেই?"

সুবোধের হাত ধরিয়া এসিস্টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টার নিজের কামরায়

লইয়া গেল, কহিল, "বসুন, বসুন, বহুদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো। একটু গল্প করি।"

ছোট ঘর। দুটি ক্লার্ক কাজ করিতেছিল। চারিদিকে ফাইলের গাদা। এক কোণে টেলিগ্রামের যন্ত্র।

"এক মিনিট বসুন, এখনি আসছি। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়ে আসি।"

মিনিট দুয়েক পর এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার ফিরিয়া আসিল, কহিল, "তারপর, কেমন আছেন?"

"ভাল"।

"আপনি তো মশাই আমাদের ভুলেই গেছেন।"

"আপনাদের ভুলবার জন্যই তো এখানে এতদিন আসি নি। তবু ভুলতে পারলুম কৈ?"

পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার আগাইয়া ধরিল সুবোধের সম্মুখে।

"আমি খাই না।"

"আগে তো খুবই খেতেন" এই বলিয়া একটু হাসিয়া এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার নিজে একটি সিগারেট ধরাইলেন।

"আগে অতো বেশি খেতুম বলেই বোধহয় এখন আর খেতে ইচ্ছে করে না। বিশ বছরের খাওয়াটা দু-বছরেই শেষ ক'রে ফেলেছি।" কথাটা শেষ করিয়া সুবোধ একটু হাসে।

এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারও একটু হাসিল।

"এখনও কি একা আছেন, না বিয়ে-থা করেছেন?"

প্রশ্নটা সে অতি সাধারণ ভাবেই করিয়াছিল। কিন্তু সুবোধ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। অদূরে জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের

যে শীর্ণ ফালিটুকু দেখা যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিল ও কিছুক্ষণ পর উত্তর দিল, "না।"

"ভালই করেছেন মশাই" এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বলিয়া চলিল "ভালই করেছেন। দূর দূর এ পোড়া দেশে কি কেউ বিয়ে করে? বিয়ে কর্‌লেই ছেলেপিলে। নিজে খেতে পাই না, স্ত্রী, ছেলেপিলেকে খাওয়াবো কি?"

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া সিগারেটে একটু জোরে টান দিয়া সে বলিল, "মাইনে পাইতো একশ পঁচিশটাকা। তাতে কি এতগুলো লোকের পেট ভরে? এখানে এখন পঁচিশ টাকা মণ চাল। আমার সংসারে মাসে তিন মণ চাল খরচ হয়। যা পাই তার অর্ধেকের ওপর তো চাল কিন্‌তে বেরিয়ে গেল। এর ওপর তরিতরকারীর দাম চতুর্গুণ বেড়েছে। তার ওপর সংসারে অসুখ-বিসুখ একটা না একটা লেগেই আছে। আর পারা যায় না মশাই, লাইফ ইজ্‌ এ হেল্‌।"

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

"তবুও এখানে যা ফ্রি কোয়াটার পেয়েছি, বাড়ি ভাড়া লাগে না। চাকরের কাজটাজ এই কুলীগুলোর মধ্যে যাকে দিয়ে হয় করিয়ে নি, এই যা। নয়তো মারা পড়তে হোতো মশাই।"

আরও মিনিট কুড়ি গল্প করিয়া সুবোধ উঠিল।

এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বলিল, "একটা গাড়ীটাড়ি ডেকে দি।"

সুবোধের কণ্ঠ অপ্রত্যাশিত গম্ভীর, কহিল, "গাড়ীর প্রয়োজন নেই। আমি এটুকু পথ হেঁটেই যাচ্ছি।"

এসিস্‌টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার সুবোধের এই গাম্ভীর্যের কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না। কহিল, "যাবার সময় দেখা করে যাবেন কিন্তু।"

সুবোধ পথে নামিয়া পড়িল। সরু মেটো পথ দিয়া ধীরে ধীরে

নদীর দিকে আগাইতে লাগিল। তাহার মন আজ অকারণে ভাসিয়া গিয়াছে বহুদূরে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ ভাবিতে লাগিল—

বিবাহ! বিবাহ কি সুবোধ করিতে চাহে নাই? লতাকে বিবাহ করিবার জন্য সে একদিন তো সর্বস্ব পণ করিয়াছিল। কিন্তু হইল কৈ?

লতার পিতারও মত ছিল এই বিবাহে। তিনি বলিয়াছিলেন. "অসবর্ণে বিবাহ হোক গে। লতারও যদি মত থাকে তবে আমার অমত হবে কেন?"

সেদিন সৌজন্য ও লজ্জার মাথা খাইয়া সে একরকম বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল। লতার সহিত বিবাহ হইবে না, লতাকে অন্য কেহ বিবাহ করিয়া চিরদিনের মত কিনিয়া লইয়া যাইবে তাহার চোখের সম্মুখে, ইহা ভাবিতেও তাহার আত্মসম্মানে অতি নিদারুণভাবে আঘাত করিতেছিল।

সুবোধ ভাবিয়াছিল লতার পিতা তাহাকে অতি রূঢ় ভাষায় কিছু বলিবেন। কিন্তু এইরূপ অভাবিত প্রত্যুত্তর পাইয়া সে প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই।

লতার পিতা আরো বলিয়াছিলেন, "তোমরা বিবাহ করবে, সংসার করবে, পরস্পর পরস্পরকে চাও, এটা আমি অস্বীকার করবো কি ক'রে? আমি জানি লতা তোমাকে ভালবাসে। তুমিও লতার অযোগ্য পাত্র ত নও। এ বিবাহ হলে আমি খুশিই হবো।"

সুবোধের মনে সেদিন বোধ করি আর এক রামধনু তাহার বিচিত্র বর্ণ সমাবেশের উজ্জ্বলতা লইয়া হৃদয়-গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আপন প্রভা বিস্তার করিয়াছিল। তাহার সে দ্যুতির লাবণ্যে সে ভাসিয়া গিয়াছিল। জীবন এক মধুময় অনির্বচনীয়

আস্বাদ তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছিল। আজ সে কথা ভাবিয়াও এক মুহূর্তের জন্ম আনন্দে তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সেই দিন বৈকালে সে লতাকে বলিয়াছিল, "তোমার বাবার আমাদের বিবাহে মত আছে।"

মুখ নিচু করিয়া লতা শুধু বলিয়াছিল, "বাবা অন্ম প্রকৃতির লোক। কোন ঝামেলাতেই থাকতে চান না, তা তো তুমি জান। অত উতলা হয়ো না, জেঠার মত হোক্।"

সুবোধ তখন সেই কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিলেও দিন-চার পাঁচ পরেই বুঝিয়াছিল।

লতার জেঠা ননী চক্রবর্তী। গ্রামের জমিদার না হইলেও জমিদারের মতই প্রভাব। স্বভাবটা অতিশয় রূঢ় ও দম্ভপূর্ণ। গত মহাযুদ্ধের সময়ে কাঠের কারবার করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন।

ননী চক্রবর্তী এই সব ব্যাপার শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "হুঁ তারপর।"

তারপর কি হইল কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না। সকলেই জানিল, দেখিল, সেদিন সে রাত্রে পেট পুরিয়া খাইয়া গেল তাঁহার বাড়িতে। লতার বিবাহ হইয়া গেল তাঁহারই এক বন্ধুপুত্রের সহিত। বিবাহটা অবশ্য স্বগোত্রেই হইয়াছিল।

লতার পিতাকে আড়ালে ডাকিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "মাধব, তোরা কি সব পাগল হলি? একরত্তি ছেলেমেয়েগুলোর এই বেহায়াপনাকে তোরা আর প্রশ্রয় দিস্‌নি। ঘরের ছেলের মত সুবোধ আসতো যেত। সে যে এ কাণ্ড করবে, এ জানলে আগে থেকে আমি ওর এ বাড়ি ঢোকা বন্ধ করতুম।"

ননী চক্রবর্তী লতার পিতার বড় ভাই। বড় ভাইয়ের অধিকার জীবনে যতটুকু তাহাপেক্ষা ইঁহার অধিকার মাধবের উপর শত গুণেরও

বেশি। বড় ভাই হইলে কি হয়, সম্পর্কটা যেন দাস প্রভুর মত। বড় ভাইএর বাড়িতে লতার পিতা আজ বারো বৎসর আসিয়া রহিয়াছেন সর্বস্বান্ত হইয়া। কলিকাতায় একটি কারবার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রচুর টাকা লোকসান দিয়াছেন। লতার বয়স তখন সাত। তখন লতা কতো ছোট! এসবের কিছুই জানে না। ধীরে ধীরে বড় হইয়া সব শুনিয়াছে। নিজেদের প্রকৃত অবস্থার কথা ভাবিয়া সেদিন সে শুধু ঐটুকুই বলিয়াছিল।

তবু লতার মুখের দিকে চাহিয়া লতার পিতা বড় ভাইকে বলিয়াছিল, "দাদা, লতা সুখী হবে তার মুখ চেয়ে—"

ননী চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন, "তাহলে তোমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। লতাকে আমি নিজের মেয়ে বলেই ভাবতুম। আজ বুঝছি সে আমার মেয়ে নয়, তোমারই মেয়ে। আমি বেঁচে থাকতে এ-বাড়িতে অসবর্ণ বিবাহের কথা স্বপ্নেও মনে এনো না।"

ইহার উত্তরে আর কি বলিবার থাকিতে পারে? লতার পিতার মুখ দিয়া ইহার পর আর কোন কথা বাহির হয় নাই।

সেই বিবাহের রাত্রি! অন্য একজনের সহিত লতার বিবাহ! অন্য এক পুরুষের সহিত লতার সংসার করিতে চলিয়া যাওয়া!—এইসব আজও সুবোধের স্পষ্ট মনে আছে। দীর্ঘ বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে, তবু এই সমস্ত ঘটনা সুবোধ ভুলিতে পারে নাই।

সেদিন লতার বড় জেঠাকে তাহার হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ, সমস্ত জ্বালা দিয়া বার বার অভিশাপ দিয়াছে। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এক মর্মস্পর্শী প্রার্থনা আপনা হইতেই ধ্বনিত হইয়াছে, "ভগবান তুমি এর বিচার কোরো।"

সুবোধের সব চেয়ে ভাবনা হইয়াছিল নিজের জন্য নয়, লতার জন্য।

সে নিজে নানান্ কাজে কর্মে মাতিয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবে। এই দুর্ঘটনার স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া আসিবে ক্রমশ। কিন্তু লতা! তাহার কি হইবে? ভাবিতে ভাবিতে সেদিন সুবোধ স্নান, আহার, নিদ্রা ভুলিয়া এক রকম পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রাম হইতে তাহার পরদিনই সে চলিয়া আসিয়াছিল শহরে পিসিমার বাড়িতে। এইখানে থাকিয়াই সুবোধ প্রফেসার হইয়াছে।

সুবোধ এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে একবার মাত্র এই গ্রামে আসিয়াছিল তাহার দাদার স্ত্রীর মৃত্যু-সময়ে। তাও ছিল এক দিনের জন্য। কলেজের কাজ, ছাত্রদের পড়ানো ইত্যাদির দোহাই দিয়া সে এক রকম পলাইয়া আসিয়াছিল। গ্রামে থাকিবে কেমন করিয়া? এখানে চতুর্দিকে তাকাইলে লতাকে যে মনে পড়ে! লতা চিরদিনের মত চলিয়া গেলেও এখানে সব কিছুর সহিত লতার স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে— লতা বাঁচিয়া রহিয়াছে। কে বলিল লতা চলিয়া গিয়াছে? লতা ত চলিয়া যায় নাই। লতার সেই নিরভিমান শান্ত মূর্তিটি সুবোধের কেবলই মনে পড়ে। লতাকে মনে পড়িলেই যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসে, শ্বাস কষ্টের মত একটি কষ্ট হয়, হার্টের আর্টারী দুইটি শুকাইয়া আসে। অবচেতন মানসের এই নিবিড় দুঃখ বাহিরের পৃথিবী জানিবে কেমন করিয়া? বুঝিবেই বা কতটুকু? তাই সুবোধ প্রকৃত কারণ কাহাকে কিছু না জানাইয়া কোন অছিলায় সেদিন গ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়াছিল।

প্রত্যেক বারই এখানে আসিবার জন্য তাহার দাদার অনুরোধকে সে এড়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এবার সে না জানাইয়াই আসিয়াছে। ভাবিয়াছে, এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বোধহয় সে লতাকে ভুলিতে পারিয়াছে, তাহার স্মৃতি মিলাইয়া গিয়াছে। সামান্য একটু স্মৃতির

শিকড় হয়তো থাকিতে পারে কিন্তু তাহা তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারিবে না।

নদীর তীরে পৌছাইল সে। নৌকা প্রস্তুতই ছিল। একটি নৌকায় গিয়া সুবোধ উঠিয়া বসিল।

"নমস্কার বাবু, পেন্নাম হই। বহুদিন পর আলেন।"

সে মুখ তুলিল, দেখিল বটু। এই বটুর নৌকায় চড়িয়া নদীতে সে কত ঘুরিয়াছে, কহিল, "তোরা সব কেমন আছিস, ভাল ত?"

সামান্য দু-একটি কথা। নৌকা ওপারে লাগিল। সুবোধ নৌকা হইতে নামিল। সেই পুরাতন ময়রার দোকান। বিধু ময়রা বসিয়া রহিয়াছে। আগের চেয়ে একটু মোটা হইয়াছে। মাথার চুল উঠিয়া গিয়া টাক্ পড়িয়াছে। কেনা বেচায় ব্যস্ত ছিল সে, তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিছুদূর আগাইয়া লাইব্রেরী ঘরটি চোখে পড়িল। লাইব্রেরীর মাথায় ছাদের উপর তাহার হাতে লেখা সাইনবোর্ডটি তখনও রহিয়াছে। কিছুটা রঙ্ উঠিয়া গিয়াছে। এগারোটায় লাইব্রেরী ঘর বন্ধ হইত। লাইব্রেরী ঘরটির নিকটে আসিয়া সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘরটি দেখিল কিছুক্ষণ।

কিছুদূর আগাইয়া চোখে পড়িল ননী চক্রবর্তীর বিরাট বাড়িটি। একাংশ নূতন করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। এই পথ দিয়াই সুবোধকে যাইতে হইবে। তাহার গন্তব্যস্থানে পৌছিতে অন্য কোন পথ নাই। দূরে এক মুহূর্ত দাঁড়াইল সে। বাড়িটির দিকে চাহিয়া পুনরায় লতাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িল। হৃদয়ের কোন নিভৃত স্থান হইতে পুনরায় একটি ব্যথার ঢেউ উঠিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শ্বাস কষ্টের মত একটি কষ্ট শুরু হইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহা মিলাইয়া গেল। যাক্ সে হাঁপ্ ছাড়িয়া

বাঁচিল। লতার বিচ্ছেদের দুঃখকে এতদিনে সে জয় করিয়াছে। দুইপা আগাইতেই তাহার চোখে পড়িল বাড়ির সম্মুখের বারান্দায় ননী চক্রবর্তী বসিয়া রহিয়াছেন। একবার আড়চোখে সুবোধ দেখিয়া লইল তাঁহাকে। ঠিক তেমনি রহিয়াছেন তিনি! শরীরে ও মুখে কোন পরিবর্তন নাই। মুখ নিচু করিয়া সুবোধ চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কাছে আসিয়া কি জানি কেন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইতে সে একবার মুখ তুলিল। তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। চোখ নামাইয়া দ্রুত পা চালাইল সে।

যাইতে যাইতে শুনিল ননী চক্রবর্তী বলিতেছেন, "আজ-কালকার ছেলে, বড় হয়েছে। গুরুজনদের সঙ্গে দেখা হলে হাত তুলে প্রণাম করতেও পারে না।"

রাগে সমস্ত গা রী রী করিয়া উঠিল সুবোধের।

পুনরায় শুনিল ননী বলিতেছেন "শুনছি নাকি প্রফেসার হয়েছে। আজকালকার যেমন সব ছাত্র, তেমনি সব প্রফেসার। দুই মানিকজোড়।"

সুবোধ আর শুনিতে পারিল না। আরও কিছুক্ষণ শুনিলে বোধ হয় সে সবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইত ও প্রতিবাদ করিত এই ব্যাঙ্গোক্তির। আরও জোরে হাঁটিয়া সে ডানদিকে ঘুরিয়া গেল।

কিছু দূরেই তাহাদের বাড়ি। সুবোধ ধীরে ধীরে বাড়িতে ঢুকিল। ছোট মাঠটিতে পচা, মধু ও বারুণী খেলিতেছিল। তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

পচা আসিয়া বলিল, "কাকে খুঁজছেন?"

সুবোধ হাসিল, চিনিল, দাদার বড় ছেলে। অবিকল দাদার মুখটি পাইয়াছে, কহিল, "তোমার বাবা কোথায়?"

"তেল মাখছেন," পচা উত্তর দিল।

সুবোধ বলিল, "তোমার বাবাকে খবর দাও, বলো কোলকাতা থেকে কাকা এসেছেন।"

পচা সুবোধের কথা শুনিয়াছিল, কহিল, "ও আপনি, আপনার কথা বাবার কাছ থেকে প্রায় শুনি।" পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল সে।

প্রবোধ তেল মাখিতে মাখিতে বাহির হইয়া আসিল। কে আসিয়াছে? সুবোধ? সত্যই ত সুবোধ যে! কহিল, "কিরে হঠাৎ?"

সুবোধ কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "বহুদিন পর তোমাদের দেখতে এলুম।"

প্রবোধ কহিল, "এতদিনে তোর সময় হলো বুঝি?" কণ্ঠে যেন কিঞ্চিৎ অভিমান।

সুবোধ একটু হাসিল। হাসি ছাড়া ইহার প্রকৃত জবাব আর কি হইতে পারে?

প্রবোধ হাসিয়া বলিল, "যা, শীগ্‌গীর গা হাত পা ধুয়ে স্নান সেরে নে। এদিকে যে বেলা অনেক হলো।"

সুবোধ আর দিরুক্তি না করিয়া দ্রুত স্নান করিতে চলিয়া গেল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পর দুই ভাই খাইতে বসিল।

প্রবোধ কহিল, "তোর খাওয়া এত কমে গেছে?"

সুবোধ কহিল, "বেশি খাওয়া কি ভাল, দাদা?"

"না, বেশি খাওয়া কোন কালেই ভাল নয়, তবে তুই যে বড় কম খাস্।"

সুবোধ হাসিল, "কোথায় কম? এই ত এত খেলুম।"

"কি আর খেলি? তোর মত বয়সে আমরা পাথর খেয়ে হজম করেছি।"

"দাদা মেডিক্যাল সায়েন্স কি বলে জান?"

"তোরা যত ঐসব পড়িস্, তত তোদের মাথা খারাপ হচ্ছে। খাবার সময় পেটভরে খাবি, সকাল-বিকাল খুব ক'রে বেড়াবি এতে তোর মেডিক্যাল সায়েন্সের মত জানবার প্রয়োজন কি?"

প্রবোধ আজ আনন্দে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার স্বভাব বড় গম্ভীর, চালচলন ধীর, কথা খুবই কম কয়। সুবোধ যেদিন গৃহত্যাগী হইল সেদিন আর একজনের অন্তরেও গভীর দুঃখ নীরবে জাগিয়াছিল। সুবোধ চলিয়া গিয়াছিল কেন সে জানিত। লতার সহিত প্রণয়ের কাহিনীটি তাহার নিকট গোপন ছিল না। ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ প্রবোধ সব জানিয়া শুনিয়াও কিছু প্রতিবাদ করে নাই। লতা চক্রবর্তী-বাড়ির মেয়ে, আর তাহারা জাতিতে বৈদ্য, ইহা জানিয়াও প্রবোধ চুপ করিয়া ছিল। লতাকে বিবাহ করিয়া সুবোধ যদি সুখী হয়, জীবনে শান্তি পায় তাহা হইলে সেইটাই তাহার কাছে সব চেয়ে বড় কথা। হউক অসবর্ণ বিবাহ, তবু সুবোধ যদি তাহার মত চাহিত সে মত দিত, কিম্বা যদি একবারে বিবাহ করিয়া বাড়ি আসিত তাহা হইলেও প্রবোধ তাহাকে সযত্নে ঘরে আশ্রয় দিত। সুবোধের প্রতি তাহার এত বড় স্নেহ। স্নেহ চিরকালই অবুঝ, লোকাপেক্ষাশূন্য।

কেনই বা না সুবোধের প্রতি তাহার এতবড় স্নেহ হইবে? প্রবোধের পিতা যখন মারা যান তখন সুবোধ মাত্র চার বছরের, প্রবোধের বয়স তখন আঠারো। সুবোধ ভূমিষ্ঠ হইতেই তাহাদের মা ৺গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। এই চার বছর বয়স হইতেই সুবোধ তাহার

কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রবোধের। নিজে পড়িয়াছে সঙ্গে সঙ্গে ভাইকেও পড়াইয়াছে। পিতার জমিজমা ও ভূসম্পত্তি যাহা ছিল তাহাও দেখিয়াছে। তাহাকে মাত্র সাহায্য করিবার ছিল তাহাদের পুরাতন পিতার আমলের গোমস্তা।

দাদার এই বুকভরা স্নেহে মানুষ হইয়া সুবোধ বহুদিন পর্যন্ত বুঝিতে পারে নাই যে সে শৈশবে পিতৃমাতৃহারা। আজ প্রবোধের পাশে খাইতে খাইতে অকস্মাৎ তাহার শৈশবের স্মৃতিগুলি মনে পড়িতে লাগিল।

"দাদা, তোমার ছোটবেলাকার ঘটনাগুলো মনে পড়ে?"

হাসিয়া প্রবোধ জানাইল, "তোর মনে আছে আর আমার মনে নেই?" কিছুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ক'রে খেয়ে নে, আমার এখনই বেরোতে হবে, একটা কাজ আছে।"

"ছুটির দিনেও তোমার কাজ। নিজের জন্যে তো কত কর জানি।" সুবোধ কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, "ছুটিরদিনে এলুম এতদিন পর আর তুমি চলে যাচ্ছ?"

"না রে আমার থাক্‌লে চল্‌বে না। একটা ভাল চাষের জমি হাত ছাড়া হয়ে যাবে। হাজার মণ ধান হয়। তবু ভাল লোকে নিলে আমার আপত্তি ছিল না। শয়তানটা নেবে। কিছুতেই নিতে দেব না।"

শয়তানটা যে কে সুবোধ ঠিক বুঝিতে পারিলেও জিজ্ঞাসা করিল, "কে নিচ্ছে?"

"এ গ্রামে আর শয়তান কটা আছে রে?"

সুবোধ বুঝিতে পারিল শয়তানটি কে, কহিল, "চক্রবর্তী মশায় বুঝি?"

প্রবোধ ঘাড় নাড়িল, কহিল, "হুঁ।"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর তো কত জমি আছে, এ জমিটাও কি উনি অন্য কাউকে নিতে দেবেন না ?"

"না ! তারপর উঁনি নিতে চান আরও কমে। যারা বিক্রি কচ্ছে তাদেরকে শাসিয়েছেন এই বলে যে, বাঘের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বনে কেউ টিকতে পারে ? সেই জন্যেই তো যাচ্ছি ওদের কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখে আসতে। চক্রবর্তী মশায়কে তো আমার আর জানতে বাকি নেই ? উঁনি খবর পেয়েছেন যে জমিটা ওরা আমাকে আজ লিখে দেবে।"

খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল। প্রবোধ হাত ধুইয়া জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া গেল। "আমার ফিরতে একটু রাত হতে পারে, ভাবিস নি।"

সুবোধের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। সুটকেশ হইতে একটি বই বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু ভাল লাগিল না, বই বন্ধ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। ট্রেনের জানিতে ক্লান্ত ছিল সে। ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে সুবোধ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। পচা আসিয়াছে, বলিতেছে, "কাকামণি, নদীর ধারে বেড়াতে যাবে ?"

কিছুক্ষণ পরে মধু ও বারুণী আসিয়া পচার সুরে সুর মিলাইল।

সুবোধ জামা কাপড় ছাড়িয়া তাহাদের লইয়া নদীর দিকে চলিল। কিছু দূর আগাইয়াছে, নজরে পড়িল ননী চক্রবর্তীর বাড়ি। যাইতে আসিতে এই বাড়ি অতিক্রম করিতে হয়। সে ধীরে ধীরে আগাইতে লাগিল।

বাড়িটির নিকটে আসিতেই ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে কে যেন কি

বলিতেছে, শুনিতে পাইল। আরও নিকটে আসিতে বুঝিল কণ্ঠটি অতিশয় ক্রুদ্ধ, ক্রমে ক্রমে সপ্তমে চড়িতেছে, শেষে কান্নায় ফাটিয়া পড়িল।

"আমি কি আপনার ছেলে নই? আমি বহুদিন বহু সহ্য করেছি। আপনার জন্যে যা করেছি তা কোন ছেলে কোন বাপের জন্যে করেছে বলে আমি আজ পর্যন্ত শুনি নি। জীবনে যা রোজগার করেছি সবই তো আপনাকেই ধরে দিয়েছি, আজ আপনি আমার এত বড় সর্বনাশ করলেন।"

সুবোধ বুঝিতে পারিল কণ্ঠটি গোপালের, চক্রবর্তীর ছোট ছেলে। সে বুঝিল টাকা কড়ি লইয়া বাপের সহিত কিছু হইয়াছে।

নদীর তীরে পৌছাইয়া সুবোধ ছেলেদের লইয়া এক ঘণ্টা-কাল বেড়াইল। পচার পেড়াপীড়িতে নৌকাতেও চড়িল খানিকক্ষণ। পথে ফিরিতে ফিরিতে দেখিল হন্ হন্ করিয়া গোপাল নদীর দিকে চলিয়াছে। সে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা চাপিয়া গেল যেন কিছুই শুনে নাই। দেখিয়াও যেন তাহাকে দেখে নাই এইভাবে পথ চলিতে লাগিল। গোপাল তাহাকে দেখিল কি না তাহার লক্ষ্য ছিল না সেদিকে।

রাত্রি দশটায় প্রবোধ বাড়ি ফিরিল।

সুবোধ খায় নাই, দাদার জন্য বসিয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কি হলো?"

"লেখাপড়া সব হয়ে গেল। বেশ একটু গোলমাল হবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু হলো না। আমাকে দেখেই সব ভেস্তে গেল। চক্রবর্তী কিন্তু একটা দাঙ্গা লাগিয়ে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী করবার ফিকিরেই ছিল। ওরা তো কেউ ভাবতেই পারেনি যে আমি নিজেই যাবো।

"আমাকে দেখেই হিরু এসে আমাকে প্রণাম করলে; বল্লে, 'বাবু আপনি ?' আমি হেসে বললাম, 'হিরু, চক্রবর্তী মশায় তোকে কত টাকা দিয়েছেন যে তুই দাঙ্গা করতে এসেছিস্ ?' হিরু মাথা নিচু করে রইল। আমি বল্লাম, 'হিরু কত কাল আর এভাবে অসৎ পথে থেকে অর্থ উপার্জন করবি ? কেন সৎ পথে থেকে কি উপায় করা যায় না ? দেখ, দাঙ্গা করলে শুধু শুধু কতকগুলো নিরপরাধ লোকের মাথা কাটবে, পা ভাঙবে, চক্রবর্তী মশায়ের বা আমার কিছুই হবে না। থানা পুলিস হয়ে হয়ে তোদেরই প্রাণান্ত হবে। তুই এত বোকা হিরু ?' হিরু আমার কথা শুনে আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'বাবু, চক্রবর্তী মশায় দু-শো টাকা দিয়েছেন। একশ টাকা এক জায়গায় ধার শোধ দিয়েছি। আর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এদের ভাড়া করে এনেছি। বাবু, আমি বড় গরীব। কিছু গোলমাল না করলে এ টাকা চক্রবর্তী মশায়কে কি করে শোধ দেব!' আমি বল্লাম 'হিরু ওঠ্, এই নে এখনকার মত একশ টাকা নিয়ে বাড়ি যা। কাল আসবি আমার কাছে, তোকে বাকি পঞ্চাশ দিয়ে দেব। হিরু, আজ যার জন্য দাঙ্গা করতে এসেছিস জমিটা তার হাতে গেলে দুঃখের সময় কি এক মুঠো চাল পাবি তার কাছ থেকে ? গত মন্বন্তরের কথা কি তোর মনে নেই ?' হিরু বল্লে, 'বাবু আপনি এ জমি নিচ্ছেন জানলে হিরু কখনও আসতো না, হিরু নেমক্হারাম নয়। আপনার উপকার জীবনে কখনো ভুলবো না। গত মন্বন্তরে আপনার কাছ থেকে চাল এনেই তো ছেলে বৌকে খাইয়েছি। চক্রবর্তী মশায় আমাদের বলেছিলেন অন্য কেউ জমিটা নিচ্ছে তাই এসেছিলুম।' আমি বললুম্ 'যা হিরু এরকম কাজ আর কখনো করিস্ নি। তোর এত বড় শরীর, ওরে বোকা, তুই গতরে খাটলে রোজ দু' তিন টাকা রোজগার করতে পারবি। তুই এসব ছেড়ে দে।"

প্রসঙ্গ শেষ করিয়া প্রবোধ বলিল, "সুবোধ বাংলা দেশে একটা কথা আছে অভাবে স্বভাব নষ্ট। কথাটা যে কতটা সত্যি আজ হিরুকে দেখে তা উপলব্ধি করলাম। যার অভাব হয় সেই জানে অভাবটা কি? দেখ এই হিরু দু-শ টাকার জন্তে আজ কত বড় কাণ্ড করতে এসেছিলো।"

প্রবোধ পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া ছয়টি গুলি বাক্সে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, "চক্রবর্তী মশায় যখন শুনবে হিরু ওঁর টাকা খেয়েও দাঙ্গা করেনি' আবার টাকা ফেরৎ দিচ্ছে তখন ওকে কি আর 'আস্তো রাখবে? যাক্ তার ব্যবস্থাও কচ্ছি। তুই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবি কোলকাতা? লোকটা কিন্তু খুব বিশ্বাসী।"

সুবোধ বলিল, "তুমি যখন বলছ তখন নিয়ে যাবো।"

"ওকে আমার সেরেস্তায় একটা কাজ দিতে পারতুম, কিন্তু এখানে থাকলে আবার খারাপ হয়ে যাবে। আজন্মকাল এই করে এসেছে, একটু ফুস্‌লানী পেলেই নিজেকে সামলাতে পারবে না। কিছুকাল গ্রাম ছাড়া হলে, হাতে দুটো পয়সা এলে দেখবি ও নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।"

সুবোধ বলিল, "বেশ তো, আমার কাছে দিন কতক থাকবে, পরে একটা কাজ-টাজ মিলে বা অফিসে ওর ভাগ্যে কি আর জুটবে না?"

খাইতে খাইতে প্রবোধ কহিল, "আসতে আসতে একটা খবর শুনলাম তুই কি কিছু জানিস্? গোপালের সঙ্গে চক্রবর্তী মশায়ের কি হয়েছে, শুনছিস? গোপাল নাকি বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে?"

সুবোধ যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহা সমস্তই প্রবোধকে জানাইল।

প্রবোধ বলিল, "উঃ! ছেলেটা নিজে কারবার ক'রে দু-পয়সা রোজগার কচ্ছে তা পর্যন্ত ওঁর সহ্য হয় না। কদিন থেকেই একটা গোলমাল চলছিলো এসব নিয়ে। জানতুম একটা না একটা কিছু হবেই।"

সকালে সমস্ত খবর মিলিল। চক্রবর্তী ছোট ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন। কাঠের কারবারে চার আনা মালিক ছিল সে। আজ পর্যন্ত যাহা দিয়াছেন সমস্তই কাড়িয়া লইয়াছেন তিনি। সেই টাকার শোকে গোপাল প্রায় পাগলের মত হইয়া গিয়াছে ও যাইবার সময় শাসাইয়া গিয়াছে যে, সে ইহার প্রতিশোধ লইবে। চক্রবর্তী মহাশয় দারোয়ান দিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

খবরটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া প্রবোধ বলিল, "চক্রবর্তী মশায় শুধু টাকাই চিনেছেন এ জগতে। ছেলে, বৌ ওঁর কাছে কেউ কিছুই নয়। অত বড় বড় ছেলে সব বাড়িতে চাকরের মত থাকে। মানুষ এতদূর অর্থ পিশাচ হতে পারে আমি তো ভাবতেই পারি না।"

মধু গড়াই আসিয়াছিল কি একটা কারণে। সব শুনিয়া সে বলিল, "দেখবে ঐ ছেলেই ওঁকে ঢিট্ করবে। গোপাল কোলকাতার পালিয়ো ছেলে। সব গোখ্রো সাপ। কত জায়গায় ঘোরে, কত কি জানে। আমার মনে হয় ও ছেড়ে কথা কইবে না।"

আরও দু-একটা কথা বলিয়া মধু গড়াই চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর হিরু আসিল। তাহাদের প্রণাম করিয়া দূরে জমিতে বসিল।

প্রবোধ বলিল, "হিরু কোলকাতা যাবি?"

হিরু বলিল, "বাবু, আপনি কোলকাতা যাবেন?"

"না আমি নয়, সুবোধ যাচ্ছে। তুই ওর সঙ্গে যা। ওখানে

গিয়ে কাজটাজ খুঁজে নিবি। আর যতদিন না কাজ পাস্ ওর কাছেই থাকবি খাবি।"

হিরু সুবোধকে চিনিতে পারে নাই, কহিল, "ওমা, ছোটবাবু এত বড় হয়েছেন! আমি চিন্তে পারিনি। মাপ কর্বেন বাবু, আমরা সব গেঁয়োভূত, আমরা আবার মানুষ।"

কথাটা শুনিয়া উভয়ে হাসিয়া উঠিল।

ঠিক হইল হিরু সুবোধের সহিত কলিকাতায় যাইবে। সুবোধের নিকট থাকিবে।

প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ টাকা ভিতর হইতে আনিয়া দিল প্রবোধ। হিরু প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সাত আট দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুবোধ কলিকাতা চলিয়া যাইবে। প্রবোধের মনটা ভাল ছিল না। কহিল, "তুই আর দিন কতক থেকে গেলে পারিস্।"

সুবোধ বলিল, "থাক্‌বার হলে আমি থাকতুম, দাদা।"

প্রবোধ এক মিনিটের জন্য কি ভাবিল, কহিল, "আমি ভাব্‌ছি এবার পচাকে তোর সঙ্গে কোলকাতা পাঠাবো। ওকে কোন স্কুলে ভর্তি করে দিবি। এখানে পড়াশুনো হচ্ছে না। আর যতই বল্ গ্রামের সোসাইটি তো এখনও ততটা উন্নত হয়নি।"

সুবোধ বলিল, "বেশ তো, দাদা, পচাকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। ভালই হবে হিরু ওকে দেখবে।"

দূরে পচা দাঁড়াইয়া ছিল; কাছে আসিল, কহিল, "কোলকাতাটা কি রকম, কাকামণি? শুনেছি বড় বড় রাস্তা ঘাট, অনেক লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া কত কি চলে। এসব কি সত্যি?"

সুবোধ কহিল, "হ্যাঁ, সব সত্যি।"

"আমি তবে আপনার সঙ্গে কোলকাতা যাবো, কাকামণি।"

রাত্রে হিরুকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠানো হইল। হিরু আসিল, কহিল, "বাবু আমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ" প্রবোধ জানাইল, "তোকে পরশুদিনই কোলকাতায় যেতে হবে। তোর একটা কাজও ঠিক করেছি। আমার ছেলে পচা যাচ্ছে। তুই আপাতত তার কাজ কর্‌বি।"

হিরু খুশি হইল, কহিল, "আপনার কাছে কাজ পেলে অন্য জায়গায় কোথায় মর্‌তে যাবো ?"

"এই নে দুটো জামা, পরে দেখ্‌ গায় হয় কি না ?

হিরু লজ্জা পাইল, "বাবু আপনাদের সামনে জামা পরবো না।"

"হিরু তুই কোলকাতায় যাচ্ছিস্ যে রে। জামা না পর্‌লে তোকে যে লোকে ঠাট্টা কর্‌বে গেঁয়ো বলে।"

"তা বলুকগে বাবু, আপনাদের সাম্‌নে এ-গাঁয়ে আমি জামা পর্‌তে পারবো না।"

প্রবোধ হাসিল। তাহার এই মর্যাদা জ্ঞান দেখিয়া খুশি হইল। তাহাকে আর পেড়াপীড়ি করিল না।

হিরু জামা দুইটি লইয়া চলিয়া গেল।

সুবোধ অবাক্ হইল। এই হিরুই কি দাঙ্গা করিতে গিয়াছিল ?

পরদিন সকালে ঘরে বসিয়া দুই ভাই গল্প করিতেছে।

প্রবোধ বলিল, "আমি আর কতদিন এসব জমিজমা দেখ্‌বো ? তুই এবার সব দেখে নে, আমাকে ছুটি দে। একটু ধর্ম টর্ম করি। কথায় বলে 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'।"

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল।

"তুই ছোটো থাক্‌তে তোর সব ভার আমি নিয়েছিলুম। এবার

তুই পচা মধু বারুণীর ভার নে। এসব কাজ আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

হঠাৎ ঘরে ঢুকিল মধু গড়াই, সঙ্গে তিন চার জন গ্রামেরই লোক। সকলেরই মুখে চোখে একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদের আভাস!

প্রবোধ ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

মধু গড়াই বলিল, "যা বলেছিলুম ঠিক তাই। গোপাল কোল-কাতার পাশিয়ো ছেলে। কত জায়গায় ঘোরে, কত কি জানে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয়!"

প্রবোধ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করেছে গোপাল? পুলিস্-টুলিস এনেছে নাকি?"

"আরে-দাদা," এক গাল হাসিয়া মধু গড়াই বলিয়া চলিল, "শুধু পুলিস, হোমরা-চোমড়া, হ্যাট-কোট্—পরা বড় বড় অফিসার! গোপাল আমার খান্‌সা-ছেলে, একেবারে ঠিক জায়গায় খবরটি দিয়েছে।"

প্রবোধ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, কহিল, "খুলেই বল না, কাকা. কি হয়েছে ব্যাপারটা?"

"হুঁ হুঁ মধু গড়াই যা বলে তা কখনও মিথ্যে হয় না। কথায় বলে, কলিকালে ছেলেরা হয় এক কাটি বেশি। ননী এতদিন ধরে যা করলে, একচালে বাজী মাৎ। সব হয়ে গেল। এইবারে যাও, হাতে হাতকড়া পরে শ্রীঘরে বাস করো গে। আহা, গোপাল আমার বড় ভাল ছেলে।" কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় সে বলিল, "এত সম্পত্তি ক'রে যে ফেল্লে, করলো কি কোরে? কোম্পানীকে না ফাঁকি দিলে হয়! সেদিন তোমার এখান থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি গোপাল এসেছে। আমাকে দেখে পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে 'মধুখুড়ো সবই তো শুনেছো। চক্রবর্তী আমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছে।'

আমি শুনে আর থাকতে পারলুম না। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলুম। গোপাল বল্লে 'কি করি, কিছু একটা উপায়-টুপায় বলো খুড়ো।" আমি উপায় ভাবতে লাগলুম। তা দাদা, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে মাথায় তো সব কিছুই খেলে। শরীরটাই নয় বুড়ো হয়েছে। বলি তা বলে বুদ্ধিগুলো তো আর বুড়িয়ে যায়নি। হেঁ—হেঁ—হেঁ। তখনই একটা মতলব মগজে এলো। গোপালকে বল্লুম, 'বাবা গোপাল, যা বলে দিচ্ছি কর্। দেখি চক্রবর্তী বাড়ির একটা ইঁট পর্যন্ত কেমন ক'রে থাকে? সোজা ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স অফিসে চলে যা।' কথাটা শুনেই গোপাল লাফ্ দিয়ে উঠলো। পরের ভোরে কোলকাতা চলে গেল।"

প্রবোধ বিস্মিত হইয়া কহিল, "সর্বনাশ! তা হলে তো চক্রবর্তী মশায়ের কিছুই থাকবে না! ভিটেটি পর্যন্তও যাবে যে।"

মধু গড়াই বলিল, "যাবার সময় গোপাল আমায় বলে গেল, 'মধুখুড়ো, আমি নিজে এসবের খাতা রেখেছি। নাড়ী নক্ষত্র কোথায় কি আছে, সব জানি। সব দেখিয়ে দেব। দশ বছরের ফাঁকি। বছরে প্রায় আট-ন হাজার ক'রে।' আমি হেসে বল্লুম 'তুই কোলকাতার পাশিয়ো ছেলে। তুই এসব পারবি। দেখিস্ বাপু আমায় জড়াস্‌নি যেন।"

মধু গড়াই যাহা বলিয়া গেল তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। বৈকালে চক্রবর্তী মহাশয়কে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও একশো বিঘা জমি ঘুষ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অফিসার সে-কথাকে আমল দেয় নাই। বরং বিরক্তই হইয়াছে।

এই সংবাদ শুনিয়া প্রবোধ কহিল, "সুবোধ, বাংলা ভাষায় একটা

চল্‌তি কথা আছে, আবরকে বধে সিরাজ, আর সিরাজকে বধেন ভগবান।"

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল।

"দেখ, বিষয় সম্পত্তি দেখতে গেলে একটু-আধটু কূটনীতি দরকার হয়। কিন্তু তাই বলে সেটা জীবনের মূলনীতি হওয়া উচিৎ নয়।"

সুবোধ অন্য দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, কহিল, "দাদা আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি।"

বেড়াইতে যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য নয়। চক্রবর্তী বাড়ির অবস্থা দেখিয়া আসাই তাহার উদ্দেশ্য।

প্রবোধ কিছু বলিবার পূর্বেই সুবোধ দ্রুত বাহির হইয়া গেল। চক্রবর্তী বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল বাড়িটি খাঁ-খাঁ করিতেছে। কেহ কোথাও নাই। চক্রবর্তী মহাশয়ের আরাম কেদারাটি বারান্দার এককোণে পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়িতে ঝড় উঠিয়াছিল। এখন সে ঝড় থামিয়াছে, ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে! সেই ঝড়ে চক্রবর্তী মহাশয় সামান্য একটি ছিন্ন পত্রের মত ভাসিয়া গিয়াছেন, চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাঁহার এ জগতের সব কিছুই—মান, দর্প, অর্থ।

অকস্মাৎ হো-হো-হো করিয়া সুবোধ হাসিয়া উঠিল। প্রতিহিংসার পৈশাচিক অট্টহাসি!! হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো! কি আনন্দ! কি স্ফূর্তি! লতার মধুময় নারীজীবন যে বিষময় করিয়া দিয়াছে, সুবোধের সমস্ত যৌবন যাহার জন্য একটানা একটা দীর্ঘশ্বাসের মত বহিয়া গিয়াছে, সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া যাহার সর্বনাশের অন্ত নাই তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর সে পাইয়াছে। হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো!

সুবোধ হাসিতে লাগিল। এমন প্রাণ-খোলা দিলদরিয়া হাসি সে আর কখনও হাসে নাই! হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো! ননী চক্রবর্তীর এই গগনচুম্বী আভিজাত্য, এই দিকজোড়া আধিপত্য, বিলাস-ব্যসনে সজ্জিত এই বৃহৎ বাড়িটি একমুহূর্তে ধূলিস্মাৎ হইয়া গেল! সামান্য একটা কয়েদীর মত সে এখন কারাগারে পচিতেছে! হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো! সুবোধ হাসে।

বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা হইল না, নদীর দিকে সে পা চালাইল। ভুলিয়া গেল সন্ধ্যা হইয়াছে বাড়ি না ফিরিলে প্রবোধ ভাবিবে। হয়তো লোকজন লইয়া তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবে।

সুবোধ আজ নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে এক দারুণ হাসির ঘূর্ণিঝড়ে। হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো! সুবোধ হাসিতে থাকে। প্রতিটি হাসির আবেগের সহিত তাহার হৃদয়ের এক একটি গ্রন্থি যেন খুলিয়া যায়, জগদ্দল পাথরের মত একটি ভার, যাহা এতদিন ধরিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া ছিল, তাহা স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে খসিয়া খসিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল ও সমস্ত শরীরে মনে ও রক্তবিন্দুতে এই দুর্বার দানবীয় হাসি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

হাসি! হাসি! হাসি! হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো। সুবোধ হাসিতেছে। চক্রবর্তী মহাশয় কয়েদীর মত এখন বন্দী, তাঁহার বিচার হইবে, জেল হইবে, ভিটাবাড়ি বিক্রয় হইয়া যাইবে, সর্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিবে, আজিকার এই আভিজাত্যের এতটুকু শীর্ণ শিষও মাথা তুলিয়া থাকিবে না, একটি ইটও সাক্ষ্য দিবে না। হো-হো-হো হো-হো-হো, হো-হো-হো! সুবোধ হাসিতে থাকে।

নদীর তীরে পৌঁছাইল সে। ঘাটে নৌকাগুলি বাঁধিয়া মাঝিরা চলিয়া গিয়াছে। একজন শুধু একটি নৌকায় দীপ জ্বালিয়া কি

করিতেছে। শীর্ণ আলোকে চারিদিকের অন্ধকার আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

নদীর তীরে কিছুক্ষণ বসিল সে। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ি ফিরিতে উদ্যত হইল।

কিছুদূর আসিয়া দেখিল দু'জন লোক হ্যারিকেন লইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতেই সুবোধ বুঝিল তাহারা তাহাকেই খুঁজিতে আসিতেছে।

পরাণ বলিল, "ছোট বাবু আপনি এত রাত্তিরে নদীর ধারে? বড়বাবু যে আপনার জন্ম ভাবছেন। চলুন, বাড়ি চলুন।"

সুবোধ কোন কথা কহিল না। নিরুত্তরে তাহাদের সহিত বাড়ি ফিরিল।

প্রবোধ কহিল, "কি রে এত রাত্তিরে কোথায় গেছ্লি একা?"

সুবোধ ছোট্ট উত্তর দিল, "নদীর ধারে।"

"বল্লেই হ'ত, সঙ্গে লোক দিতুম। কখনও আর এ রকম একা একা যাস্নি।"

সমস্তক্ষণ সুবোধ গম্ভীর হইয়া রহিল। সুবোধের এই অকস্মাৎ গম্ভীর হওয়ার কারণ কেহ বুঝিল না। প্রবোধও নয়।

রাত্রিতে খাইয়া সুবোধ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইল। এই নিঃসঙ্গ একাকী থাকিতে তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া পুনরায় সেই হাসির তরঙ্গ উঠিতে লাগিল—হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো! সে ঘুমাইতে পারিল না। ঘুমাইবে কি করিয়া? শরীর তো তাহার বিশ্রাম চাহিতেছে না। শুধু সে অভ্যাস বশেই আসিয়া শুইয়াছে। ঘুম তো তাহার পায় নাই। তাহার শরীরের শিরা-উপশিরায় বিশ্রামের তো এতটুকু আমেজও নাই। একটি দুর্বার হাসি তরঙ্গে তাহারা তরঙ্গায়িত

হইয়া উঠিতেছে। ফুলিয়া ফুলিয়া সেই নারকীয় হাসি কেবলই বাজিয়া উঠিতেছে। হো-হো-হো, হো-হো-হো, হো-হো-হো।

রাত্রি বারোটা বাজিল—একটা বাজিল—দুইটা বাজিল, সুবোধের তখনও ঘুম আসিল না। শয্যা ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল। সামনের খোলা ছাদে আসিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইল। বাথ-রুমে গিয়া হাতে, মুখে, চোখে ঠাণ্ডা জল দিল। পুনরায় শয্যায় গিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ তন্দ্রার ঘোরে সুবোধের চোখদুটি পড়িয়া আসিয়াছে, অকস্মাৎ আবার সেই দানবীয় হাসি শিরায় শিরায় জাগিয়া উঠিল।

এইবার সে বিস্মিত হইল। তাহার ভয়ও হইল, মুখ শুকাইয়া আসিল। এ কি? এই অদম্য হাসির তরঙ্গ হৃদয়ের কোথা হইতে উঠিতেছে? কি আশ্চর্য! তাহার মনে হইল তাহার অলক্ষ্যে তাহার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে বসিয়া কে যেন হাসিতেছে? কে এ?

গভীর চিন্তায় সুবোধ ডুবিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে একটি সদুত্তর পাইল ইহার।

ইতিহাসের ছাত্র সে। আদিম প্রস্তর যুগের বন্য মানুষ এই হাসি মুখে লইয়াই পৃথিবীর বুকে আসিয়াছিল। তাহার অন্তর্ধানের সহিত সেই হাসিও এই মাটি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সভ্যতার পর সভ্যতা আসিয়া তাহার সেই হাসির শেষ রেষটুকুও মানুষের হৃদয় হইতে মুছিয়া দিয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা সে পড়িয়াছে, পড়াইয়াছে ও পড়াইতেছে।

ভুল, ভুল, ভুল। ইতিহাসের এই শিক্ষা ভুল। কোথায় সেই বন্য-মানুষ মরিয়া গিয়াছে? কোথায় তাহার সেই হাসি মুছিয়া গিয়াছে? আজ তাহার অন্তরের অন্তস্থলে বসিয়া প্রতিহিংসায় উন্মত্ত সেই

আদিম অসভ্য মানুষই তো হাসিতেছে! এতো তাহারই সেই অসংযত হিংস্র বন্য হাসি!

সমস্ত রাত্রি সুবোধ একপ্রকার জাগিয়াই কাটাইল। বেলা সাতটা বাজিতে দ্বার খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

প্রবোধ সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একটি রাজমিস্ত্রীর সহিত কি কথা কহিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া কহিল, "কিরে? কাল রাতে ঘুম হয়নি নাকি?

"না।" সুবোধ উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, "মোটেই ঘুম হয়নি।"

"তোর যেমন কাণ্ড। অত রাত্তিরে নদীর ধারে বেড়াতে যায়, নিশ্চয়ই তোর ঠাণ্ডা লেগেছে।"

প্রবোধ কাছে আসিল, সুবোধের মাথায় হাত দিয়া কহিল, "গা তোর বেশ গরম দেখছি। ছেলেমানুষ সব, তোরা কোনো কথাই তো শুনবি না।"

"ও কিছু না। দুপুরে দু-একঘণ্টা ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।" সুবোধ হাসিয়া বলিল, "তুমি একটুতেই বড় ব্যস্ত হও দাদা।"

প্রবোধ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "বেশ তো এবার থেকে আর তোর জন্য ব্যস্ত হব না।"

দুপুরে দু-ঘণ্টা ঘুমাইয়া সত্যই সুবোধের দেহ হইতে সমস্ত গ্লানি চলিয়া গেল। সন্ধ্যায় স্নান সারিয়া প্রবোধকে বলিল, "দাদা তুমি যে পচার তিনখানা জামা ও তিনটে হাফ্‌পেন্ট তৈরী করতে দিয়েছিলে কৈ আননি তো?"

প্রবোধ হিসাবের খাতা দেখিতেছিল, কহিল, "ইস্ একেবারে ভুলে গেছি তো। এখনই একটা লোক পাঠিয়ে দে, নিয়ে আস্‌বে।"

কিছুক্ষণ পর হিরু আসিল। আজিকার রাত্রি সে এখানে ঘুমাইবে। ভোর পাঁচটায় ট্রেন।

রাত চারটায় সময় পচাকে লইয়া সুবোধ গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। হিরু তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে পচার ছোট সুটকেশটি লইয়া হাঁটিয়া চলিল।

চক্রবর্ত্তী বাড়ির কাছে আসিয়া ছাউনি হইতে মুখ বাহির করিয়া একবার বাড়িটি দেখিল সে।

হিরু কহিল, "বাবু, চক্রবর্ত্তী মশায়ের কি হবে?"

সুবোধ বলিল, "বোধ হয় জেল হয়ে যাবে।"

"শুনছি নাকি বাড়িটাড়ী কিছু থাক্‌বে না, কোম্পানী সব বিক্রি ক'রে নেবে।"

"হ্যাঁ, তবুও সব টাকা মিটবে কি?"

"বলেন কি, বাবু! আমাদের তো দু'পাঁচ টাকাও মাপ-কর্‌তেন না। কোম্পানীকে এত টাকা ঠকিয়েছেন?"

সুবোধ একটু হাসিল।

হিরুর চেনা মাঝি নৌকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল! সকলে গিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা প্রস্তুতই ছিল ছাড়িয়া দিল।

শীতের আমেজ আজ শুরু হইয়াছে। হিম পড়িতেছে, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বহিতেছে। সুবোধ সুটকেশ হইতে পচার গরম কোটটি বাহির করিয়া পচাকে পরিতে বলিল। পচারও একটু শীত শীত করিতেছিল, পচা কোটটি লইয়া পরিল।

হিরু কাপড়ের খুঁটখানি গায়ে জড়াইয়া বসিয়া ছিল।

সুবোধ কহিল, "হিরু এবার জামাটা পর। এখানে তো তোর বড় বাবু নেই।"

হিরু কহিল—"আপনি তো রয়েছেন।"

"কি ছেলেমানুষি হচ্ছে হিরু," সুবোধ ধমক দিয়া বলিল, "জামাটা পর্। নতুন ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা লেগে গেলে, কে তোকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভুগবে?"

এক দম্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া নৌকাটিকে দোলাইয়া গেল। সুবোধ নিজে কমফর্টারটি মাথায় ও গলায় ভাল করিয়া জড়াইয়া বসিল। হিরু এবার জামাটা পারল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া এসিস্‌টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টারের কামরায় সে প্রবেশ করিল।

একটি ভাঙ্গা আরাম-কেদারায় বসিয়া এসিস্‌টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টার ঢুলিতেছিল। শব্দ পাইয়া জাগিয়া উঠিল, কহিল, "এই ভোরের ট্রেনেই যাচ্ছেন বুঝি?"

"হ্যা।"

"সঙ্গে ছেলেটি কার?"

"দাদার।"

"কোলকাতায় পড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝি?"

"হ্যা। ট্রেন আস্‌তে আর কত দেরী?"

"এইতো এলো বলে।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেনের আলো দেখা গেল। দু-এক মিনিটের মধ্যে ট্রেন হু-হু শব্দ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

সুবোধ পচা ও হিরুকে লইয়া ট্রেনে উঠিল।

পচা কখনও ট্রেনে চড়ে নাই। ট্রেন ছাড়িলে ভয় পাইল। সুবোধের কাছে সরিয়া আসিয়া বসিল।

সুবোধ বলিল, "কিরে ভয় কচ্ছে নাকি?"

পচা কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুবোধের একটি হাত তাহার হাতের মধ্যে টানিয়া লইল শুধু।

রূপান্তর

তিন মহলের মধ্যে নাটমহল সব চেয়ে বড়ো। কেন যে বড়ো এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় খুব সহজে। নাটমহলে বারোমাসে তেরো-পার্বণ লেগেই আছে। আর রায়বাড়ির পার্বণ তো এমনি হতে পারে না! গ্রামের সমস্ত লোক সেদিন জমায়েৎ হবে সেখানে। পেট পুরে খাবে কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব। সারারাত দীর্ঘ উঠানে বসে দেখবে রংতামাসা, যাত্রা আর পুতুল নাচ।

গত বছর ঝুলনের সময় শহর থেকে রায়বাড়ির কর্তারা সিনেমা আনিয়েছিলেন। পাঁচ দিনের মধ্যে প্রথম দুদিন হলো কীর্তণ আর থিয়েটার আর শেষ তিন দিন লম্বা টানা সিনেমা। টকি তখনো হয় নি। গ্রামের লোক হতভম্ব। আশ্চর্য! ছোট সাদা একটা পর্দায় ফুটে উঠেছে জীবন্ত মানুষ, এতো বড়ো বিরাট একটা জগৎ! সত্যই বিস্ময়কর।

এ বছর দুর্গাপূজায় মহোৎসবের আয়োজনে কোন ক্রুটি নেই। ছদিন (পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত) রাত্রে উৎসব চলবে। ঠিক হয়েছে প্রথম দুদিন হবে থিয়েটার, তৃতীয়দিন হবে কীর্তণ, তারপরের দুদিন হবে যাত্রা ও শেষের দিন হবে পুতুলনাচ।

ও পুজোর সময় একবার ক'রে নাট-মন্দিরে রঙ পড়ে। প্রায় পঞ্চাশজন মিস্ত্রি লেগেছে। রায়বাড়ির ছোট কর্তাই সব দেখা শোনা করছেন। বড়োর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। অন্যসময়েও বিশেষ ক'রে খাওয়ার পর কোন প্রকার পরিশ্রম করতে পারেন না তিনি। মেজ-কর্তাকে তো আজ ছ-বছর বাতে করেছে পংগু। সারাদিন তিনি শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেন। কাছারিতেও আসতে পারেন না। খুব জরুরী হলে কিছুক্ষণের জন্যে একবার উঠে আসেন। তারপর আবার চলে যান। বাড়ির ছোটবাবুর স্বাস্থ্যই একমাত্র ভালো। শুধু ভালো কেন, সবল ও সুদৃঢ় বলা চলে। প্রত্যহ নিয়মমত ব্যায়াম করেন তিনি। ঝড় হোক, জল হোক ছাতে উঠে ব্যায়াম করা তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজের পর্যায়-ভুক্ত।

কাজেই বিরাট রায়বাড়ির সমস্ত কিছু তদারক করতে হয় তাঁকে। বড়ো ও মেজকর্তা সব কিছু তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। এই এতো বড়ো পুজো সামনে কিন্তু বড়কর্তা খাওয়ার পর রোজকার মতো নিয়মে ঠিক বিশ্রাম করতে চলে গেলেন তেতালায় তাঁর শোবার ঘরে। মেজ লাঠি ধরে ঠক্‌ ঠক ক'রে সিঁড়িতে খানিকটা উঠে রেলিং ধরে হাঁপাতে লাগলেন। আর ছোটকর্তা বেরিয়ে এলেন মিস্ত্রিদের কাজ পরিদর্শন করতে।

গোপাল পাশে এসে দাঁড়ালো প্রণাম ক রে। গোপাল বাড়ির পুরানো চাকর। সারাটা জীবন সে এই রায়বাড়িতেই কাটিয়ে দিলে। বয়েস তার ষাট; যখন সে প্রথম কাজ করতে এসেছিলো, তখন তার বয়েস ছিলো ছয়। এই সুদীর্ঘ চুয়ান্ন বছর সে রায়বাড়ির ধুলোমাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। কোনো কিছুতেই সে যাবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সে এখানে বিলিয়ে দেবে নিজেকে এই

তার পণ। সেবার বসন্ত দেখা দিলো যখন গ্রামে, মাত্র পনেরো দিনে গ্রামের যখন অর্ধেক লোক উজাড়, রায়বাড়ির সমস্ত লোকজন চাকর বামুন মালী দারোয়ান, সব পালাচ্ছে একমাত্র শুধু তখন সেই রয়ে গিয়েছিলো। রায়বাড়ির সকলে কম অবাক হয় নি। গোপালের সেই থেকে প্রতিপত্তি বেড়েছে রায়বাড়িতে। বাড়ির চাকর সে অবশ্য, কিন্তু চাল-চলন ও হাব-ভাবে তাকে বাড়ির কোন আত্মীয় বলেই মনে হয়।

হাতের গেলাসটা ছোটকর্তার হাতে দিয়ে গোপাল বললো ;—"ছোটবাবু এবার পুজোয় বায়স্কোপ দিচ্ছেন তো!"

খাবার পর পেটে ডাবের জল না পড়লে ছোটকর্তার লিভার ভালো কাজ করে না। খাবারগুলো যেন আটকে যায় মাঝপথে। তাই গেলাসটা পাবামাত্রই তাতে চুমুক দিয়ে বললেন ;—"এবার তোদের যাত্রা শোনাবো। ভালো যাত্রা নলহাটির।"

গোপাল একটু যেন বিরক্ত হয়ে জানালো,—"যাত্রা আর কি শুনবো বাবু! শুনে শুনে তো বুড়ো হয়ে গেলুম। তার চেয়ে—" গোপাল থেমে গেলো, হঠাৎ মাথা চুলকাতে লাগলো।

হাতের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে ছোটকর্তা বললেন ;—"তার চেয়ে কি, বল! থেমে গেলি কেন? আনন্দ করবি তোরা! কি চাস্ বল্ না! সময় আছে এখনো।"

এক গাল হেসে গোপাল বললো ;—"এই, গ্রামের সকলে বলছিলো যদি গতবারের ঝুলনের মতো বায়স্কোপ দেন দুদিন!"

"বেশ তো!" হাতের গেলাসটা দু-চুমুকে শেষ ক'রে গোপালের হাতে দিয়ে ছোটকর্তা আবার বললেন ;—"হরিহরকে ডেকে দে তো। শহরে লোক পাঠিয়ে দিক এখুনি।"

হরিহর রায়বাড়ির নতুন গোমস্তা। কম বয়েস, কাজে তৎপর। ছোটকর্তা খুব পছন্দ করেন ওকে।

হরিহর এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়াতেই ছোটকর্তা বললেন,—"শুনেছ হরিহর, গ্রামের লোকে তোমার ঐ নলহাটির যাত্রা শুনতে চায় না। তারা তার বদলে চায় বায়স্কোপ।"

হরিহরই ছোটকর্তাকে বলে কয়ে ঠিক করেছিলো এই যাত্রার দল। হরিহরের সহোদর দাদার দল এটি। হরিহর আগে কাজ করতো খনিতে। হঠাৎ তার জেঠামশাই মারা যেতে এখানে তাকে নিতে হলো এ-কাজ। এ-কাজ তাদের অনেক পুরুষের। এ-কাজ তো আর ছাড়া চলে না! যেটুকু লক্ষ্মীর দয়া কুড়িয়েছে তারা সেটা তো রায়বাড়িরই দৌলতে। খনিতে থাকতে থাকতেই সে শুনেছিলো তার দাদা শঙ্কর একটি যাত্রার দল গঠন ক'রছে। অনেক ক'রে খনি থেকে অসময়ে একবার ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এসেছিলো যাত্রা শুনতে শঙ্করের। কিন্তু শঙ্কর তার দিন কতক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলো তার দলবল নিয়ে ঝিঁঝিঁটপুরে বায়না পেয়ে। হরিহর চিঠি দিয়ে আসেনি। ভেবেছিলো হঠাৎ এসে চমকে দেবে সকলকে। চিঠি দিয়ে এলে হয়তো এতোটা আঘাত সে পেতো না। শুধু নিরাশ হতো সে। ভাবতো নয় আরো কিছুদিন পরে শুনতে পাবে। এবার সুযোগ বুঝে তাই সে ছোটকর্তাকে ধরেছিলো নলহাটির যাত্রা আনার জন্যে। ছোটকর্তাও সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রজারা করবে আমোদ-আহ্লাদ তিনি মাঝখান থেকে বাধা দিতে যাবেন কেন? পুজোপার্বণের মূল উদ্দেশ্য সকলে মিলে মিশে একটা দিন খুব হৈ-চৈ করা, অন্তত সকলে বৎসরান্তে মিলিত হওয়া একস্থানে কিছুক্ষণের জন্যে, তা তিনি বুঝতেন। হরিহরও বুঝতো

ছোটকর্তার মন। সে ছোটকর্তার কাছ থেকে এসে গোপালের কাছে গেলো।

"ও গোপাল-দা, গোপাল-দা!"

ছোটকর্তাকে ডাবের জল দিয়ে এসে উঠানে চৌবাচ্চার জলে গেলাস ধুয়ে যেই গোপাল একটু ঘুমোবার আয়োজন করছে এমন সময় হরিহর উপস্থিত। ঘুমের ওপর গোপালের চিরকালের একটা দুর্বলতা আছে। সারাদিন লোকে ওকে যতো ডাকুক, কাজের ফরমাস করুক গোপাল হাসিমুখে সব করবে। বিরক্ত ছেড়ে সে খুশিই হবে। এখনো সে কত কর্মঠ! সে না হলে রায়বাড়ির চলে না কারোর! কিন্তু ঘুমানোর সময় ডাকলে সে রাখতে পারে না নিজেকে; বিরক্তি চাপতে পারে না সে কিছুতেই। সে মনে করে এ অনধিকার প্রবেশ। সে যে-ই হোক আর যে-ই ডাকুক। কোনো উত্তর দেয় না সে। বালিশটা ঠিক ক'রে রেখে এলিয়ে পড়ে মাদুরের ওপর।

—"গোপাল-দা! ও গোপাল-দা!" হরিহর তবু ডাকতে থাকে গোপালকে। সে জানে গোপাল ইচ্ছে ক'রে সাড়া দিচ্ছে না। সে চেনে ভালো ক'রেই গোপালকে।

ঘরের কড়া আবার নড়ে উঠলো। গোপাল এতোক্ষণ জোর ক'রে চোখ বুঁজে শুয়েছিলো। কিন্তু হরিহর তাকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেবে না।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলে;—"কি? কি?"

"একটু দরকার আছে গোপাল-দা দরজাটা তো খোলো!"

কি আর করে গোপাল! যতোই হোক গদাধরের ভাই-পো তো হরিহর! উঠে গিয়ে দ্বার খুলে ভেতরে নিয়ে আসে হরিহরকে।

হরিহর শুরু করে;—"শুনলাম তোমরা নাকি যাত্রা-টাত্রা শুনবে

না গোপাল-দা! আমি বলছিলুম কি, যাত্রা একেবারে বন্ধ ক'রে দিও না, অন্তত একদিন হোক। তোমাদের বায়স্কোপ হোক আর দুদিন। সব দিক তো দেখতে হবে! তোমরা যেমন আনন্দ পাবে আর সকলকেও তো তেমনি আনন্দ দিতে হবে!"

গোঁপালের ঘুম যখন আসে, তখন তা আসে বানের জলের মতো, কোনো বাধাই মানে না। সব কিছু ছাপিয়ে তা বয়ে যাবেই! ঘুম-জড়ানো চোখে সে তাই বললো;—"আচ্ছা গো আচ্ছা সে-সব কথা পরে হবে। এখন তো ঘুমোতে দাও একটু।"

"না হে গোপাল-দা, যা হয় এখুনি একটা ঠিক ক'রে ফেলো। আমায় শহরে ছুটতে হবে সন্ধের ট্রেনে।"

গোপালের দুচোখ ঘুমে ঢুলে আস্‌ছিলো। তাড়াতাড়ি সে প্রসংগটা শেষ করতে পারলেই বাঁচে! এ ঘুম যদি তার চড়ে যায় তো আর তার ঘুম হবে না সারাদিনেও। তার ওপর সন্ধে থেকে আবার পরিশ্রম করতে হবে। ছুটি পাবে গভীর রাতে।

"আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে।"

"দেখো, আবার যেন বাগ্‌ড়া দিও না শেষে!"

"না গো না! তুমি ভেবো না বাবু। গোপাল যখন কথা দিচ্ছে তখন আর খেলাপ হবে না কখনো।"

"বেঁচে থাকো গোপাল-দা।" হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হরিহর। গোপাল গভীর আরামে ও তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পঞ্চমীর দিন সকালে প্রতিমা দেখতে এলেন রায়বাড়ির সকলে। যে যেখান থেকে পারে এসেছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ আর বাদ নেই। রায়বাড়ি গিস্‌গিস্ করছে লোকে। ছোট ছেলে

ও শিশুর সংখ্যা হবে বোধ হয় পঞ্চাশ। পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলেদের সংখ্যা হবে তিরিশ। বৌ-ঝিদের আর অবিবাহিত মেয়েদের নিয়ে সবশুদ্ধ সত্তর। সে এক আজব ব্যাপার!

বড়োকর্তার সব চেয়ে প্রিয় শিশুটির বয়েস পাঁচ বছর। ডাক নাম তার ভুলো। ছোটকর্তার বড়ো মেয়ের ছোটো ছেলে। চমৎকার ফুটফুটে ছেলেটি। চালাক-চতুরও বটে। ঘুঁড়ি ওড়াতে আর ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসে। সকলের কাছে যায় কোন বাছে না।

শ্যামলী বাড়িতে পা দিতে না দিতেই বড়োকর্তার হুকুম তার কানে পৌঁছুলো। প্রথমেই সে উঠে গেলো বড়োকর্তার ঘরে ভুলোকে নিয়ে। বড়োকর্তাকে দেখে ভুলোর আর আনন্দ ধরে না। ছুটে মার কোল থেকে সে বড়োকর্তার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। বড়োকর্তা তাকে কোলে তুলে নিলেন; এঁকে দিলেন তার কপালে আর সীমন্তে অনেক চুমা।

"দাদু, আমার ঘুঁড়ি আর ফুটবল্!" ভুলো বললে।

"এই যে দাদু!"

আলমারী খুলে বড়োকর্তা বার করলেন এক ডজন বড় বড় ঘুঁড়ি আর একটি লাটাই। আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলো ভুলো। দাদুর হাত থেকে ওগুলো নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে করতে শ্যামলী মৃদু হেসে বললো;—"তাই মামার বাড়ি আসার জন্যে কি কান্না!"

বড়োকর্তা ভুলোকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন;—"তুমি ওড়াতে পারবে দাদু"?

"হ্যাঁ, আর কতো ঘুড়ি কাটবো!" ব'লে জানলার ফাঁকে

তাকিয়ে অনেক দূরে একটা ঘুঁড়ি উড়তে দেখে বললো ;—"ওকেও ব্যাং-কাট্টা ক'রে দেবো ? দেখবে ?"

বড়োকর্তা বললেন হাসতে হাসতে ;—"আচ্ছা বিকেল হোক।"

"বিকেল ?" দুচোখ কপালে তুলে ভুলো বললো ;—"সে যে অনেক দেরী দাদু !"

শ্যামলী এবার ভুলোর হাত ধ'রে তিরস্কারের ছলে বললো ;—"নে চল নিচে চল্ ! ওর জন্তে এখন এই দুপুরে ছাদে যাবে !"

বড়োকর্তা হাসতে হাসতে বললেন ;—"আহা ! বকিস কেন মা ? ছেলে-পুলে একটু ডান পিটে হওয়া ভালো।" তার পর ভুলোর দিকে ফিরে বললেন ;—"আচ্ছা, তোমার সংগে যদি ছাদে যাই দাদু, তুমি তাহলে ছাদে পৌঁছেই কি করবে ?"

ভুলো কেমন ক'রে ঘুঁড়ি ওড়াবে, কেমন ক'রে লাটাই ধরবে, কেমন ক'রে ঘুঁড়ি কাটবে, আর কাটলেই কেমন ক'রে জানান দেবে যে সে ঘুঁড়ি কেটেছে ইত্যাদি সব বদ্ধ ঘরের মধ্যেই দেখিয়ে দিলে হাত পা চোখ মুখ নেড়ে।

শ্যামলী না হেসে থাকতে পারলে না। বললে ;—"হয়েছে, হয়েছে। এখন নিচে চল। সকলের সংগে দেখা করতে হবে না ?"

ভুলো ভেবেছিলো তার এই ঘুঁড়ি ওড়ানোর অসামান্ত দক্ষতা দেখে দাদু তাকে নিয়ে সটান্ ছাদে উঠবে আর কেমন কুচ্ কুচ্ ক'রে সে ঘুঁড়ি কাটে সেই দেখে দাদু তাকে আরো বড়ো বড়ো ঘুঁড়ি ও দামী লাটাই কিনে দেবে ! তাই শ্যামলী যখন বললো নিচে যেতে, সকলের সঙ্গে দেখা করতে সে তখন অসহায় ভাবে বড়োকর্তার দিকে তাকালো একবার।

দাদু বুঝলেন মনের ভাব। হেসে বললেন ;—"ভয় কি দাদু ?

মায়ের সঙ্গে নিচে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে শিগ্‌গির চ'লে এসো ওপরে। আমিও ততক্ষণে একটু ঘুমিয়ে নি। তারপর তোমায় নিয়ে সেই যে ছাদে উঠবো, ব্যাস একেবারে সেই সন্ধে পর্যন্ত।"

ভুলোর মুখ আনন্দে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দৌড়ে শ্যামলীর আগেই সে নিচে নেমে গেলো।

সন্ধের সময় ছাদ থেকে নামতে নামতে ভুলো বললো ;—"তোমার মান্‌জাটা মোটেই ভালো নয় দাদু! তোমায় ঠকিয়েছে।"

বড়োকর্তা কৃত্রিম রাগত কণ্ঠে বললেন ;—"তাই তো! ভারি ঠকে গেছি! আচ্ছা কাল সে ব্যাটাকে দেবো তোমার সামনে দাঁড় করিয়ে। যতো পারো ব্যাটাকে চাবুক কসিয়ো। কেমন?"

ভুলো ভড়কে গেলো ;—"না, না, দাদু অতো রাগ কোরো না ওর ওপর। ও কি আর জানে যে তুমি আমার জন্যে কিনেছো? তা হলে কি আর ও ঠকাতে সাহস করতো তোমাকে?"

"ঠিক, তা ঠিক। তা হলে তো ওর দোষ নেই! দোষ সবটাই আমার। কি বলো? অ্যাঁ?"

ভুলো ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ তাই।

"আচ্ছা কাল তা হলে আমার দোষের জন্যে তোমাকে আরো খানকতক ঘুঁড়ি আর ভালো মান্‌জা কিনে দেবো, কেমন?"

"তাই ভালো দাদু।" একটু হেসে ভুলো আবার বললো ;—"আচ্ছা তা হলে তো তুমি ওকে মারধোর করবে না দাদু? অ্যাঁ?"

"না না, বাঃ! তাকে মারধোর করবো কেন? তার দোষ কি?"

শ্যামলী হাতের থালায় করে বড়োকর্তার জন্যে জলখাবার নিয়ে আসছিলো। সিঁড়ির মোড়ে দেখা।

ভুলো তাড়াতাড়ি বললো ;—"মান্‌জাটায় ফাঁকি ছিলো না, অন্ন তো—"

"হয়েছে বাপু, তুই থাম দিকিনি একটু। দেখা হলেই খালি ঘুঁড়ি আর মান্‌জা আর ফুটবল্! যা নিচে যা।"

দুপুরে বিশ্রাম না পাওয়ায় বড়োকর্তার শরীর এলিয়ে আসছিলো। ভুলোকে ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন ঘরে। ভুলো আর অবলম্বন না পেয়ে বিরস মনে নেমে গেলো নিচে।

মহাষ্টমী। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনি ঢাক ঢোল কাঁসি বেজে উঠবে। মায়ের আরতি হবে। ভুলো বড়োকর্তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িময়।

ভুলো জিজ্ঞাসা করলে ;—"দাদু ওটা দিয়ে কি হবে ?"

"ওটা কি বলো দিকি আগে ?" বড়কর্তা বললেন।

অনেকক্ষণ ভেবে ভুলো বললো ;—"ঠিক মনে পড়ছে না দাদু নামটা। পড়েছে, মনে পড়েছে দাদু ! ছাগল।"

"ঠিক হয়েছে। বাঃ।"

"ওটা দিয়ে কি হবে দাদু ?"

"মায়ের কাছে ওকে বলি দেওয়া হবে।"

"বলি কি দাদু ?"

"ওকে মায়ের প্রসাদ ক'রে আমরা খাবো।"

"ও" ভুলো চুপ ক'রে গেলো।

বার বার বলা সত্ত্বেও ভুলো বলির সময় কিছুতেই সে-স্থান ছেড়ে গেলো না। সকলে ওকে যতো টানাটানি করতে লাগলো ও ততো জোরে বড়কর্তাকে আঁকড়ে ধ'রে রইলো। শেষে বড়োকর্তাই বললেন ;—"থাক ও আমার কাছে। কোনো ভয় নেই।"

শ্যামলী ডেকে পাঠালো অন্দরে লোক দিয়ে। তবু ভুলো গেলো না। বড়োকর্তাকে চেপে ধরে রইলো।

ক্রমে ক্রমে মায়ের আরতি শুরু হোলো। প্রায় আধ ঘণ্টা পর আরতি শেষ হোলো। এবারে বলি হবে।

হঠাৎ ঢাক, ঢোল, বাঁশী খরতাল সব একসংগে চতুর্দিক মুখরিত করে বেজে উঠলো। বলি হয়ে গেলো। ভয়ে বিস্ময়ে দাদুর কোলে ভুলো সেই যে মুখ লুকোলো আর তুললো না কিছুতেই। বড়োকর্তা ভুলোকে দু-একবার ডাকাডাকি ক'রেও কোনো সাড়া না পেয়ে কেমন যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন। আবার ডাকলেন। আবার। কোনো সাড়া নেই। অজ্ঞান।

বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো ভুলোর অচৈতন্যের সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেলো সমস্ত বাড়িময়। মেয়েমহলে কান্নার রোল প'ড়ে গেলো। শ্যামলী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো সেখানে। রায়বাড়ির মেয়ে এই প্রথম উৎসবের দিনে একরাশ লোকের সামনে বাইরের মহলে এলো।

ধরাধরি ক'রে ততক্ষণে ভুলোকে তোলা হয়েছে। শ্যামলী এসে বড়োকর্তার পায়ের ওপর কেঁদে পড়লো ;—"কি হবে জ্যেঠামশাই ?"

বড়োকর্তার শোক এতোক্ষণ আয়ত্তে ছিলো। এবার কূল ছাপালো। বিকৃতগলায় তিনি বললেন ;—"আমারই কপাল মা! ওকে যদি না আমি ওখানে রাখি আমার কাছে, তা হলে কি আর এ বিপদ হয় ?" দুচোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রুর বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়তে লাগলো বড়োকর্তার।

মেয়েরা ছুটে এসে শ্যামলীকে সামলালো।

ছোটকর্তা ডাক্তার আনতে ছুটেছিলেন নিজেই। ডাক্তার সশব্যস্তে এসে হাজির। পনেরো মিনিট ধরে পরীক্ষা করে বললেন ;—"না,

কোনো ভয়ের কারণ নেই! সিম্প্লি এ কেস অব নারভাস ব্রেক ডাউন, হার্ট এণ্ড লাংস ভালোই আছে।"

সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মেয়েরা চলে গেলো কাজে। শ্যামলীও নেমে এলো খানিকক্ষণ পর। ভুলোর কাছে শুধু রইলেন বড়োকর্তা।

সেদিন রাত্রে ও তার পরের দুদিন রাত্রে উৎসব জমলো না একেবারেই। জমিদার বাড়িতে অসুখ থাকলে কি কখনো প্রজারা প্রাণ খুলে আমোদ করতে পারে?

ভুলোর অসুখ শেষে অন্য রূপ নিলো। সেই থেকে মাঝে মাঝে ফিট শুরু হলো, আর বুকে বসলো সর্দি ও শেষে রূপান্তরিত হলো কড়া অসুখে দুদিনের মধ্যে। বাধ্য হয়ে দশমীর কাজ কোন রকমে শেষ করতে হলো! ঘটা করে প্রসেসান করে গ্রাম কাঁপিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া আর সম্ভব হলো না। বাড়িতে সকলেই রইলেন। কেবল ছোটকর্তা জনকতক লোক নিয়ে গিয়ে নদীতে প্রতিমা ভাসিয়ে দিয়ে এলেন।

তারপর চললো ভুলোর চিকিৎসা। শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারের মিটিং বসে গেলো বাড়িতে। জলের মতো রায়বাড়ির পয়সা খরচ হয়ে যেতে লাগলো। দূর-সম্পর্কের মেয়েরা আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগলেন এবার। শেষে নিকটস্থ দু-একজন আত্মীয়ও চলে গেলেন। শ্যামলী ও তার ছয় বোন শুধু রয়ে গেলো।

ভুলোর অসুখে সব চেয়ে বেশি রাত জাগলো আর পরিশ্রম করলো গোপাল আর হরিহর। গোপাল করলো ভুলোর সেবা আর হরিহর করলো যোগাড়। যে ওষুধ গ্রামে নেই, আশপাশের দশ-বিশটা গ্রামেও নেই সে-ওষুধ শহরে গিয়ে সন্ধের মধ্যে এনে হাজির করলো হরিহর। আশ্চর্য ক্ষমতা হরিহরের। আর গোপাল? কথায় বলে 'মরা হাতি লাখ টাকা'! এ যেন হলো তাই। গোপাল কাউকে রাত জাগতে

দিলো না। শ্যামলীকে বকাবকি করে সে ঘুমোতে পাঠালো। বড়ো-কর্তাকে রাত্রে পা-টিপে ঘুম পাড়িয়ে তবে সে এসে বসলো ভুলোর মাথার কাছে। আর সেই যে বসলো গোপাল, বেলা নটা পর্যন্ত সেইখানেই সে বসে রইলো।

একদিন শ্যামলী বললো ;—"গোপালদা, এসব করে তোমার না কিছু একটা হয়। সে আবার হবে আমাদের আর এক ভাবনা।"

গোপাল বললো ;—"তুমি থামো তো দিদিমণি। মিছে দিক করো নি। যাও শুতে যাও।"

এর ওপর কী আর বলা চলে! শ্যামলী শুতে চলে গেলো।

পুরো দেড় মাস ভুগে ভুলো ভালো হয়ে উঠলো। পথ্য পেলো আরো দিন চার পাঁচ পরে। অমন সুন্দর স্বাস্থ্য ভুলোর একেবারে চুপ্‌সে এতোটুকু হয়ে গেছে। আগেকার দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি এখন কালি-পড়া চোখের কোটরে বসে গেছে। গায়ে রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত শরীর ক্যাকাশে, বিবর্ণ, পাণ্ডুর।

দিন পনেরো পর ভুলো যখন উঠে দাঁড়াতে পারলো, বড়োকর্তা তখন ওকে নিয়ে চেঞ্জ-এ গেলেন। শ্যামলীও সংগে গেলো।

তারপর এক এক করে কেটে গেছে অনেক বছর। দশ, পনেরো ও ক্রমে তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশের কোঠায় এসে পড়েছে।

রায়বাড়ির পরিবর্তন হয়েছে অনেক ; একটা ঝড় যেন বহে গেছে এর ওপর দিয়ে। তার আঘাতে শত-ছিন্ন শত-দীর্ণ হয়ে সমস্ত বাড়িটা নুয়েপড়া একটা বুড়োর মতো যেন ধুঁকছে। সারা গায়ে নেমেছে এর একটা ভারী অবসাদ আর ক্লান্তি—যেন এ শ্বাসকষ্টে হাঁপাচ্ছে।

গা বেয়ে এর বহে গেছে ছোট্ট একটি নদী। গ্রীষ্মে তাতে জল থাকে

না বললেই চলে। মানুষ হেঁটে পায় হয়ে যেতে পারে। তখন ওর ওপর দিয়ে চলে পাল্‌কী। কিন্তু বর্ষাকালে এই নদী ফুলে ফুলে ওঠে জলভারে। রায়বাড়ির কাছ বরাবর, প্রায় কাছারি পর্যন্ত জল ঠেলে ওঠে।

সেই নদীতে পাল্‌কী করে গ্রামে আসছিলো ভোলানাথ,—আমাদের সেই শিশু ভুলো। সংগে তার স্ত্রী হৈমবতী, ছেলে শৈলেন আর মেয়ে আদুরী। ভোলানাথের মনে আজ তোলপাড় শুরু হয়েছে। কেন সে আসছে? কেন? এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আসার তার কী প্রয়োজন ছিলো!

ঘন দেওদার ও ঝাউগাছগুলোর মধ্যে দিয়ে রায়বাড়িটাকে তার মনে হচ্ছিলো যেন কোনো পরিত্যক্ত ভুতুড়ে-বাড়ি। ইঁট খসে খসে পড়ছে, খানিকটা ভেঙে গেছে ওদিকের পাঁচিল, হাড়-পাঁজ্‌রা-সম্বল যেন এক মরণাপন্ন রোগী মাটির বিছানায় যন্ত্রণায় শুয়ে কাতরাচ্ছে।

ভোলানাথ মনে মনে বোঝে, এ আর অন্য কোন রোগ নয়, এ রোগ মরণের। এ রোগের হাত থেকে আর ওর কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি নেই। কোন বৈদ্যই রায়বাড়ির এ-রোগ সারাতে পারবে না। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ভোলানাথ অন্যদিকে মুখ ঘোরালো।

হৈমবতী কাছে সরে এসে একটি হাত গায়ে দিয়ে ও আর একটি হাত সামনে বাড়িয়ে বললো;—"ঐ রায়বাড়ি দেখা যাচ্ছে, না?"

ঘাড় নেড়ে শুধু জানালো ভোলানাথ। কথা বলার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

হৈমবতীর মনে আজ নিদারুণ অভিমান। বিয়ের পর সে কতোবার বলেছে তাকে একবার নিয়ে যেতে রায়বাড়িতে, একবার তার সঙ্গে রায়বাড়ির সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু প্রত্যেকবারই ভোলানাথ বলেছে তাকে যে, সামনের পুজোয় তাকে নিয়ে যাবে।

শুধু এই আশ্বাস ছাড়া আর কোন আশ্বাস পায় নি সে তার কাছ থেকে।

বেশি কথা বলতেও ভোলানাথের সংগে তার মন সরে না, ভয় করে। দু-একবার সে চেষ্টা করেছিলো জেদ করে ভোলানাথকে কোনো একটা কাজ করাবেই। কিন্তু তার ফল হয়েছিলো উলটো। ভোলানাথ নিষ্প্রাণ দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো তার কর্তব্য সম্পাদন করেছিলো শুধু। সে যেন আরো বিরক্তিকর লাগে হৈমবতীর। বরং ভোলানাথ না যায় সে ভালো। কিন্তু যাবে অথচ প্রাণ নেই, দেবে অথচ দেবার বাসনা নেই সে যেন হৈমবতীর কাছে এক দুরন্ত কষ্ট বলে, তার নারীত্বের দুঃসহ অপমান বলে মনে হতো। সে কারণ হৈমবতী আর পেড়াপীড়ি করতো না, শুধু বছর বছর পুজোর আগে একবার স্মরণ করিয়ে দিত তার যাবার কথা।

অমনি ভোলানাথ মৃদু হেসে বলে উঠতো, 'ভোলো নি দেখছি'।

মনে মনে আক্ষেপের সীমা থাকতো না তার। সে ভুলে যাবে রায়বাড়িকে? তাদের সংগে আলাপ করিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞাটি? রায়বাড়ি যে তার কাছে কী, তা সে অন্য লোককে বোঝাতে পারবে না। ইদানিং রায়বাড়ির নাম শুনলেই তার চোখে জল আসতো। অনেক কষ্ট করে বিবাহিত জীবনের এই দীর্ঘ পনেরো বছর সে তার চোখের জল গোপন করে এসেছে। কিন্তু এই সেদিন সে ধরা পড়ে গেলো ভোলানাথের কাছে।

ভোলানাথ জানতো ও বুঝতো সব কিন্তু কোনো প্রতিকারের চেষ্টাও করতো না। আর কি ক'রেই বা করবে? শহরে তিনটে দোকান তার। একটা লোহার, একটা কয়লার, একটা চালের। হু-হু ক'রে সব দাম বাড়ছে আর পসার বেড়ে চলেছে ভোলানাথের। প্রথম

মাসেই তার তিনটে দোকান থেকে লাভ দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার। বাপের দেনা সে ডেকে ডেকে সব শোধ দিয়েছে। এই বাজারে সে এখন হৈমবতীকে নিয়ে যায় কি ক'রে রায়বাড়িতে? গেলেই তো আর অমনি ছাড়বে না সকলে! খাওয়া, ঘোরা, শিকার-করা, পিকনিক-করা, জলসা—অন্তত দিন পনেরো তাকে না আটকে কিছুতেই কেউ ছাড়বে না। কিন্তু এ সব ব্যবসা ফেলে এখন ভোলানাথ যায় কেমন করে?

এই তো সেবার সে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলো দুদিনের জন্যে। তারই মধ্যে এসে পুলিসে হাংগামা করে গিয়েছিলো। তার দোকানের নাম ব্লাক-বুকে তুলে দিয়েছিলো চাল ষ্টক করেছিলো বলে। দোকানের লোকগুলো তার যদি কোন কাজের হতো! একটুও যদি বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকতো ওদের! যতো সব বোকা আর বজ্জাৎ এসে জুটেছে ওরই দোকানে! শেষে প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচা করে সমস্ত মিটমাট করতে হয়েছে তাকে। ব্লাক-বুক থেকে নাম কাটানোর জন্যে ফাইন্ দিতে হয়েছে তাকে আরো প্রায় হাজার খানেক! এই তো মজা দুদিনের জন্যে দোকান ছেড়ে কোথাও যাওয়ার!

কিন্তু এবার আর ভোলানাথ না এসে পারে নি। এতো বছর স্ত্রীর অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে যুঝে যুঝে সে দুর্বল হয়ে এসেছে। তাছাড়া তাকে আটকাবার তো কেউ নেই। শিগগিরই সে ফিরতে পারবে। তাই, এবার আর তাকে বলতে হয় নি। আপনা হতেই সে আসছে।

ভোলানাথের ছেলে শৈলেন হাতে 'রাইফেল' নিয়ে উঁচিয়ে বসেছিলো এতক্ষণ। এবার হঠাৎ ফায়ার করলো। শালতী একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলতে লাগলো। বন্দুকটা শালতীর ওপর রেখে দিয়ে লাফ দিয়ে চললো সে তার লক্ষ বস্তুটির দিকে। সকলে তাকিয়ে

রইলো তার আগমন প্রতীক্ষা ক'রে। ঝাউগাছের ঝোপ থেকে রক্তাক্ত একটি বক হাতে ক'রে গর্বোন্নত মস্তকে নৌকায় ফিরে এলো সে। আদুরী আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠলো।

ভোলানাথের ভালো লাগছে না আজ এ সব। তার মন ছুটে গেছে চল্লিশ বছরের আগেকার একটি উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে অনেক দূরে।

এই রায়বাড়ি ছিলো তখন গানে গল্পে হাস্যে কৌতুকে সদ্যস্নাত কোনো যুবতীর দেহের মতো স্নিগ্ধ। তখন সে ছিলো নিতান্ত অসহায় একটি শিশু, নিতান্ত অপোগণ্ড একটি ক্ষুদ্র বালক। না ছিলো তার কোনো দৃঢ়তা, না ছিলো কোনো সহিষ্ণুতা। একটু আঘাতেই সে মুষড়ে পড়তো, একটু বেদনাতেই সে কেঁপে উঠতো, কেঁদে ফেলতো!

আশ্চর্য! নিজের কাছে আজ এই প্রথম নিজেকে কেমন যেন অচেনা অজানা লাগলো তার। সে তো এমন ছিলো না! নিজের অজ্ঞাতসারে এতো বদলে গেছে সে? এতো রূপান্তরিত হয়ে গেছে সে?

পায়ের কাছে নিহত বকটার দেহ থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে প'ড়ে খানিকটা স্থান রক্তে লাল হয়ে গেছে।

সেদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও কোনো অনুভূতি সে আজ খুঁজে পেলো না মনের ভিতর। কোনো সুরের শব্দ নেই, যেন নিথর মাটির ঢিপির ওপর কে হাতুড়ি পিটছে! 'ঠং' কি 'ঠক্' কোনো শব্দ নেই, শুধু প্রতিঘাতের একটা নিষ্প্রাণ ও মরা প্রত্যুত্তর।

এবারে আর হৈচৈ হলো না পূজোয়। থিয়েটার, বায়স্কোপ, যাত্রা সব বাদ পড়েছে। গ্রামের লোকেরা আর আপত্তি জানাতে আসে নি। আর জানাতে আসবেই বা কোন মুখে? জমিদার বাড়ির যে আর সে-দৌলত নেই এ তো আর লুকোনো কথা নয়!

শেষ জীবনে যে ছোটকর্তার অতো বড়ো কড়া অসুখ হয়েছিলো চিকিৎসা কি করানো হয়েছিলো তার? বলতে গেলে একরকম বিনা চিকিৎসাতেই তো তিনি দেহ দিলেন! এ আপশোষ কি আর গ্রামের কারোর মিটবে! অতো বড়ো একটা মহাপ্রাণ নষ্ট হয়ে গেলো পয়সার অভাবে।

শেষদিন পর্যন্ত কিন্তু তাঁর চেতনা ছিলো। মেজকর্তা যখন শেষে এই রায়বাড়ি বন্ধক দিয়ে চিকিৎসার খরচ যোগাতে মনস্থ করলেন, তখন ছোটকর্তাই তাঁকে ডেকে হাতে-পায়ে ধরে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'মেজদা, ভালো হবার হলে এমনিতেই ঠিক সেরে উঠবো; কিন্তু আমাকে সারাতে গিয়ে যদি সকলে তোমরা ভিটে-বাড়ি ছাড়া হও তো আমার সে-বাঁচা হবে মরার চেয়ে ঢের বেশি করুণ। একটু ভেবে দেখো মেজদা'।

এ-সব কথা আর গ্রামের কে না জানে? তারপর একে একে সকল কর্তারা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা দেহ রাখলেন। অতো বড়ো রায়বাড়ি শেষে হয়ে দাঁড়ালো জনমানবহীন দৈত্যদানবের আখড়া।

তবু, বড়োকর্তার নাত্‌নীর সম্পর্কের কে একজন এসে যে এ-সময়ে পূজোটা করে সে-জন্যে গ্রামের লোক তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। হ'ক নিতান্ত নিরাভরণ, নিতান্ত সাধারণ পূজো। তবু পূজো তো! না হক বায়স্কোপ, না হক থিয়েটার, পালাগান আর যাত্রা, তবু যে মায়ের নাম হয় বৎসরান্তে একবারও রায়বাড়ির দরদালানে সেই যথেষ্ট!

গত বছরে তবু পালাগান হয়েছিলো। এবার তাও আর হবে না। গ্রামের লোকেরা প্রথমে ভেবেছিলো চাঁদা তুলে এ বছরেও পালা গান দেবে। কিন্তু পরে বিবেচনা ক'রে দেখলো সেটা করা যুক্তিসংগত হবে না।

চালের মন তখন বাইশ টাকা। চাল বেচে তারা লাভ করেছে অনেক, কিন্তু আজ দেখছে পেয়েছে খাবারের পরিবর্তে কতক-গুলো ছাপানো ভাঁজ-করা কাগজ! না, চাঁদা তুলে পালাগান দিতে তারা কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

পঞ্চমীর দিন সকালবেলা গ্রামের লোকেরা রায়বাড়ির দরদালানে তাদের অভ্যাসমত এবারেও দিয়ে গেলো একটি ভাঙা কাঁসর, একটি ঘড়ি, আর একটি ঘণ্টা। সব শেষে সন্ধের সময় গণেশ নিয়ে এলো ছুটো পাঁঠা।

ভোলানাথের ছেলে শৈলেন বাইরেই ছিলো। পাঁঠা ছুটোকে দেখে বললো;—"বাঃ! চমৎকার পাঁঠা তো! মন্দ হবে না আজ রাত্রে!"

মহাষ্টমীর দিন বলির সময় ভোলানাথের উপর সমস্ত বাইরের ব্যবস্থার ভার পড়েছে।

সে প্রথমেই ঝিয়ের কোলে ছোট্ট একটি ছেলেকে দেখে ব'ললো;— "ওদের কেন এনেছো এখানে? এ কখনো ওদের সহ্য হয়? বড়ো হোক তখন দেখবে।"

মিনতি-দি

মিনতি-দির স্বামী মারা গিয়াছে। খবরটা শুনিয়াই দুঃখে, শোকে ও আতঙ্কে কেমন যেন হইয়া গেলাম।

মিনতি-দি স্ত্রীর বড়ো বোন, মাত্র দুই বৎসরের বড়। এই বয়সে তাহার এত বড় সর্বনাশ হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস হইয়াও বিশ্বাস হইতে চাহে না!

বিবাহের বহু পূর্ব হইতেই এই দুই ভগ্নীর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিলো। ছোটবেলায় ইহাদের সহিত কত খেলাধুলা করিয়াছি। তখন কে জানিত যে ভবিষ্যতে ইহাদের সহিত আমাকে এমন মধুময় সম্পর্কে জড়াইয়া পড়িতে হইবে।

মিনতি-দির স্বামীর সহিত আমার বন্ধুত্ব বিশেষ ছিল না, দেখাও বড় একটা হইত না, কিন্তু তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বুঝিলাম তাহাকে কতখানি ভালবাসিতাম ও সে আমার কত আপনার জন ছিল!

সংবাদটা পাইয়া অবধি কেবলই মিনতিদির কথা মনে পড়িতেছে। যতই তাহার কথা ভাবিতেছি ততই প্রবল দুঃখে সমস্ত মন ইক্ষুদণ্ডের মত কে যেন নিঙড়াইতেছে!

এদিকে স্ত্রীর কথা ভাবিলাম। তাহাকেই বা এই সংবাদ কেমন করিয়া দিই? এই কুড়িদিন হইল তাহার একটি কন্যা হইয়াছে, এখনও সে সূতিকাগারে। শরীর অতি দুর্বল, ভাল করিয়া চলিতেও পারে না। এই স্নায়বিক দুর্বলতার উপর এত বড় শোক-সংবাদ শুনিয়া তাহার পরিস্থিতি যে কি হইবে, ইহা ভাবিয়াও মনে দুশ্চিন্তার অন্ত রহিল না।

ধীরে ধীরে বাড়ি প্রবেশ করিলাম। বেকার এঘর ওঘর ঘুরিয়া এখানে সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। মধ্যে গদা একবার আসিল, কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আমার গম্ভীর ভাব ও রুক্ষ চেহারা দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এই ভাবে কাটাইলাম।

ক্রমে ক্রমে মনে সাহস সঞ্চিত হইল। ভাবিলাম যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার জন্য এত উদ্বেগ, এত চিন্তা কিসের? জন্মিলে একদিন মরিতেই হইবে, ইহা এই জগতে অতি নির্মম সত্য! এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই ত মানুষ জীবন যাপন করিতেছে, নীড় বাঁধিতেছে। তবু এই সত্যটির সহিত মুখোমুখী সাক্ষাৎ হইলেই লোকে এতটা চঞ্চল হইয়া পড়ে কেন? নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া এতটা বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে কেন?

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ইহার কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর মনে আসিল না। নানা চিন্তাতে মন যেন আরো ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

আরো অর্ধঘণ্টা পর ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম ও স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রথমে কি কথা কহিব এই লইয়া সাতপাঁচ ভাবিতে লাগিলাম।

সিঁড়ির নিকট আসিতেই মায়ের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"সব শুনেছিস্ তো?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, শুনিয়াছি। কথা কহিবার শক্তিও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি।

মা বলিলেন, "বৌমাকে খবরটা নিজেই শুনিয়ে এলুম। কি জানি, ছেলেমানুষ, যদি প্রথমে শুনেই সামলাতে না পারে।"

এত দুঃখেও প্রাণ হইতে একটি স্বস্তির নিশ্বাস বাহির হইল। যাক্ মায়ের মুখ হইতে শুনিয়াছে, ভালই হইয়াছে! আমাকে বলিতে হয় নাই।

মা বলিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্?"

আমি বলিলাম, "কোথাও নয়, নিচে যাচ্ছি।"

মা বলিলেন; "বৌমার কাছে গিয়ে একটু বোস্। একলা আছে। আমি এই তো এতক্ষণ ছিলাম সঙ্গে থেকে। যাই আহ্নিক পূজা কিছু হয়নি।" যাইতে যাইতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন; "উঃ ভগবান! তোমার রাজত্বে এমন বিপদও মানুষের হয়!"

মা চলিয়া গেলেন।

আমি ধীরে ধীরে স্ত্রীর জন্য যে ঘরটি প্রসূতি-গৃহ করা হইয়াছে সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। দেখিলাম সে অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিয়াছে।

প্রথমে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। পরে আমার পদ-শব্দ পাইয়া আমাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। আমি অদূরে চেয়ারটি টানিয়া বসিলাম।

প্রথমে কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা সরিল না। স্ত্রীর চোখ বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শোকের একটি স্রোত আমারও ভিতরে প্রকাশের জন্য উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। সংযত হইয়া আমি তাহার রাশ টানিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলি, "মনে করছি কাল একবার মিনতি-দির কাছে যাবো"।

স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "কাল তোমায় যেতে হবে না। আরো কিছু দিন যাক।"

"তাই ভালো। হপ্তাখানেক পরেই যাবো।"

এক সপ্তাহ বলিয়াছিলাম কিন্তু যাইতে দশ-বারো দিন হইয়া গেল।

দূর হইতে মিনতিদির প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি নজরে পড়িল। যতই কাছে আগাইতে লাগিলাম ততই মন তাহার নিকট যাইতে চাহিল না। তবু আগাইতে লাগিলাম।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরাইয়া গেটে ঢুকিল। বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া বিরাট পোর্টিকোর নিচে ড্রাইভার গাড়ী থামাইল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। মিনতিদির পুরানো চাকর নিধু আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরের ঘরে বসাইল।

মিনিট পাঁচেক পর নিধু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ওপরে চলুন"।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিধু আগাইয়া আমাকে পথ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, আমি তার পিছে পিছে চলিলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে একটানা মার্বেলের সিঁড়ি বাহিয়া, সুচারুরূপে নির্মিত এবং বহুমূল্য তৈজসপত্রে সুসজ্জিত বড় বড় হলঘরগুলি দেখিতে দেখিতে ক্রমে চতুর্থ তলায় আসিয়া পড়িলাম।

নিধু বলিল, "এই যে, এই ঘরে।"

আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া দুরু দুরু বুকে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

সমস্ত ঘরটিতে শোকের ছায়া। ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাত্র এক কোণে একটি ছোট

টেবিল। তাহার উপরে মিনতিদির স্বামীর একটি ছোট ছবি। নিচে জমিতে একটি ছোট বিছানা। তাহার সম্মুখে একটি ছোট গালিচা। গালিচার উপরে মিনতিদি মুখ নিচু করিয়া বসিয়া আছে।

মিনতিদি আমাকে দেখিয়া একবার মুখ তুলিল ও অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "বসো"

আমি নিকটে গালিচার উপরে বসিয়া পড়িলাম।

চকিতের ন্যায় একবার মনে পড়িল একমাস পূর্বে এই মিনতিদি কী ছিল!

স্ত্রী নয় মাস অন্তঃসত্ত্বা বলিয়া আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে। অশেষ গুণে বিধাতা তাহাকে গুণবতী করিয়াছেন। যেমন অমায়িক, তেমনি ধীর, তেমনি আবার হাস্যরসিক স্বভাবটি। সামাজিক দিকটাও রক্ষা করিয়া চলিত ষোল আনাই।

আমি সেদিন বলিয়াছিলাম; "তুমি তোমার বোনের এত খোঁজ নাও দিদি, কিন্তু ও তো তোমার কোনই খবরাখবর করে না।"

মিনতিদি হাসিয়া বলিয়াছিল; "ও যে ভাই ছোট, ওর সাত খুন মাপ।"

সত্য কথা বলিতে কি, মিনতিদির মধ্যে বয়সানুপাতে নারীর স্নেহপ্রবণ মাতৃত্বের দিকটার প্রকাশই বেশি। আমাপেক্ষা তিন চার বছরের ছোট সে, কিন্তু ঠিক ছোট ভায়ের মত দেখিত আমাকে।

"তোমার দাদা" মিনতিদি বলিয়াছিল "একটা নতুন গাড়ী কিনেছে। রোজই বলছে 'যাও যাও ঘুরে এসো খানিকটা'। ও সদাই কাজে ব্যস্ত। একা একা কোথায় যাবো ভাই? তোমরা চল ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি। কতক্ষণই বা লাগবে?"

ডায়মণ্ডহারবারের নামে মনটা সেদিন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও সেই

সময়ে স্ত্রীর বাড়ির বাহির হওয়া নিষিদ্ধ মনে হইতেই চাঞ্চল্যটি দমন করিয়া বলিয়াছিলাম, "কি করে যাবো দিদি, বলো? তোমার বোনটি তো এক ফ্যাসাদ্ বাধিয়ে বসে আছে।"

মিনতি বলিয়াছিল—"বেশ অত দূর নয় নাই গেলে, এমনি খানিকটা ঘুরে এলে আর কি হবে? চল চল।"

খানিকটা ঘুরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম সেদিন স্ত্রী লইয়া। তাহার এমন বুক-ভরা স্নেহের অমর্যাদা করিতে সাহসে কুলায় নাই।

মাষ্টার বুইক। সবে কেনা হইয়াছে। আসিবার সময় দেখিলাম গাড়ীটা গ্যারাজে তোলা রহিয়াছে। বোধ হয় এখন আর কেহ চড়ে না। চড়িবেই বা আর কে?

সেই হাস্যচপল ও অরুণোদয়ের মত আনন্দ ভরপুর মিনতিদি, আর অন্ধকার শোকার্ত নিরাভরণ বিধবা মিনতি!! বুকের ভিতরটা একবার হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। মিনতিদি মুখ নিচু করিয়াই বসিয়া রহিল। পরে কহিল "দিন কতক আগে এলে দেখা হতো।"

আমি কিছু উত্তর দিতে পারিলাম না। দিবই বা কি?

শেষ দেখা করিতে পারি নাই বলিয়া আমারও আপশোষের অন্ত নাই। মিনতিদির নিকট হইতে তাই এই কথা শুনিয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া রহিলাম।

মিনতিদিও মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর মিনতিদি বলিল, "কিছুতেই কিছু করা গেল না। এত ডাক্তার, এত ওষুধ, এত চিকিৎসা কিছুই কাজে লাগল না" বলিতে বলিতে মিনতিদির চোখ বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

আমার বুকের ভিতরটা যেন জ্বালা করিতে লাগিল। আমি

এই করুণ দৃশ্য চোখ তুলিয়া দেখিতে পারিলাম না। চোখ নামাইয়া লইলাম।

মিনতিদি চোখ মুছিয়া বলিল, "আমাকে এই ক-মাস ধরে খালি বলতো, 'আমি মরে গেলে তুমি খুব কষ্ট পাবে, না?' আমি প্রথমটা কিছু বলতুম না। শেষে রাগ ক'রে দিন কতক কাছেই যাই নি।" কিছুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "তখন কি জানতুম ভাই, আমাকে ফেলে রেখে ও সত্যি সত্যি এমনি ক'রে পালিয়ে যাবে?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু পুনরায় সজল হইয়া উঠিল ও দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কোন কথাই মনে আসিতেছে না। কি কথা কহিব? একটি অব্যক্ত ব্যথা কেবল হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গুমরাইতেছে!

মিনতিদি পুনরায় চোখ মুছিল। অদূরে টেবিলের উপর রক্ষিত তাহার স্বামীর ফটো-খানির দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি ধীরে ধীরে একটি প্রশ্ন করিবার চেষ্টা করি, "শেষকালে কি হলো?"

মিনতিদি ফটোখানি হইতে চোখ নামাইয়া লইল। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিল, কহিল, "ওর হার্টের ট্রাবল তো ছিলই ভাই, শেষকালে হার্ট ফেল হলো।"

মিনতিদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি কত মানা করতুম, অতো খাটতে। উত্তরে ও বলতো 'কোম্পানীর একটা বড় কাজ ধরেছি, বছরে দু-লক্ষ টাকা লাভ থাকবে। একটু না খাটলে চলবে কেমন করে? এই কাজটা পাবার জন্যে দু-বছর ধ'রে চেষ্টা করছি।' আমি এর উপর আর কি বলবো ভাই, চুপ করে

থাকতুম।" তাহার দম যেন ফুরাইয়া আসিল, ও মনে হইল নিশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে।

পুনরায় একটি নিশ্বাস টানিয়া সে বলিতে শুরু করিল, "শেষে যা ভয় করলুম তাই হলো। অতো খাটুনি ভাঙা শরীরে কি সয়? হার্ট ট্রাবল শুরু হলো। আর তিন দিনের দিনই—" সে আর বলিতে পারিল না কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বজ্রাহতের মত আমি বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিনতিদি বলিল, "করুণা যখন হয় আমি তো মরেই গেছলুম। হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। দু-তিন ঘণ্টা পাল্‌স্‌ও পাওয়া যায় নি। বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন যদি মরে যেতুম।" অশ্রুর আর একটি আবেগ আসিয়া তাহার চক্ষু দুইটি ভরিয়া দিল, "আমার কপালে যে এই লেখা রয়েছে। আমি যাব কেমন করে? আমি চ'লে গেলে আমার এমন দশা ভুগবে কে?"

শোকের এই উলঙ্গ বাস্তব রূঢ়তা ক্রমশ সহ্যসীমা অতিক্রম করিতেছিল।

আমি এই প্রসঙ্গ ঘুরাইবার চেষ্টা করি, বলি, "ছেলেরা কোথায়?"

সে জানাইল "নিচে খেলা করছে।"

"কেমন আছে ওরা?"

"ভাল। মাঝে জ্যোতির একটু পেট খারাপ হয়েছিল। এখন ভাল আছে।"

ইতিমধ্যে বাহিরে শিশু কণ্ঠে চিৎকার শুনিলাম। করুণা, মিনতিদির ছোট ছেলে, একটি টয়গান হাতে লইয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ বন্দুক তুলিয়া টিপ করিল। কহিল

"ওয়ান, টু, থ্রী, ফায়ার," ধুপ্ করিয়া বন্দুকের ছিপিটি সশব্দে খুলিয়া গেল।

এক মুহূর্তে ঘরের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ একটু নির্মল হইল। আমি হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলাম।

মিনতিদি কহিল "কি হচ্ছে করুণা? চুপ করে মেশমশায়ের কাছে বসো।"

করুণা বন্দুকটা রাখিয়া দিয়া কহিল "মেশমশায় আমার কি রকম টিপ দেখলেন?"

আমি একটু হাসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম "খুব ভাল।"

করুণা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "মেশমশায়, আমি বড় হয়ে খুব বড় একটা বন্দুক কিনবো, বনে বাঘ মারতে যাব। বলুন না মেশমশায় বাঘ মারতে পারবো না?"

আমি বলি "নিশ্চয়ই পারবে। শুধু বাঘ মারবে কেন? হাঙ্গর, কুমীর, গণ্ডার, ভাল্লুক সব মারবে।"

করুণা অত্যন্ত খুশি হইল, কহিল "আমি মস্ত শিকারী হব মেশমশায়" এই বলিয়া পুনরায় বন্দুকটি তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল ও কহিল, "আর একবার আমার টিপ দেখবেন?"

আমি বলি, "পরে দেখবো, তুমি এখন চুপটি করে বসো।"

করুণা চুপ করিয়া বসিল ও বলিল "আমায় কেন চুপ করে বসতে বলছেন তা জানি, আর কেন আপনি এসেছেন তাও জানি।"

আমি একটু অবাক হইলাম।

করুণা বলিল "আমি জানি, আপনি বাবাকে আনতে যাচ্ছেন।"

এক মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়ায় পুনরায় মেঘ জমিতে লাগিল।

"মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা কোথা চলে গেছে। আমি

মাকে এত করে বলি যে বাবা ঠিক ফিরে আসবে। আমাদেরকে ছেড়ে বাবা ক-দিন থাকতে পারবে? মেশমশায় আমি আপনার সঙ্গে বাবাকে আনতে যাবো।"

আমার গলা জড়াইয়া করুণা বায়না আরম্ভ করিল, "আমায় সঙ্গে নিন্ না মেশমশায়, আমি একটুও দুষ্টুমী করবো না।"

আমার বুকের ভিতরটা আবার যেন কেমন করিয়া উঠিল। ছেলে মানুষ, যে যাহা বুঝাইয়াছে, তাহাই বুঝিয়াছে। সে জানে না মৃত্যু কি, কত ভীষণ!

মিনতিদির চক্ষু দুইটি পুনরায় সজল হইয়া উঠিল।

করুণা ম্লানমুখে বলিল, "ওই দেখুন মেশমশাই, মা আবার কাঁদছে। আপনি একদম দেরী করবেন না মেশমশাই। যাবেন আর বাবাকে নিয়ে আসবেন।"

আমারও চক্ষু দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। ব্যথায় একটি প্রবল আবেগ উঠিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সম্বরণ করিয়া বলি;—"হ্যাঁ করুণা তুমি আমার সঙ্গে যাবে। যাও শিগগির খেয়ে নাও।"

করুণা হাসিয়া বন্দুক তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর ধরা-গলায় মিনতিদি কহিল, "আমার ত যা সর্বনাশ হবার হয়েই গেছে, ভাই। তার জন্যে আর ভাবি না। আমি তো মরেই আছি। যে মরেছে তার জন্যে আর ভাবনা কি? ভাবি কেবল এই দুটো ছেলের জন্যে। এদের কি করে মানুষ করবো?"

আমি বলিলাম, "জ্যোতির কত বয়েস হোলো?"

"এই ভাদ্র মাসে ভর্তি বারো হোলো। আর করুণা ত সবে পাঁচে পড়েছে।"

ইতিমধ্যে পুরাতন সরকার ঘরে প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "কতক্ষণ এসেছেন ?"

"এই এক ঘণ্টা।"

"এটা সই করতে হবে মা।" বলিয়া সরকার একটি কাগজ মিনতিদির সামনে ধরিল।

মিনতিদি তাহাতে সহি করিল ও দু-একটা কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি সে দিকে কান দিলাম না। প্রায় দশ-পনর মিনিট কথাবার্তা কহিয়া সরকার প্রস্থান করিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, "তোমাদের কাজ কারবার এখন কে দেখছে ?"

"এই পুরানো সব সরকার মহুরীরাই দেখছে।"

সংবাদটি শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। তাহাদের কালির ও লেমনেডের বিরাট কারবার। এতবড় দুইটি ব্যবসা তাহা হইলে ত পাঁচজনে লুটিয়া খাইবে !

মিনতিদি বলিল, "কাজের আর আমি কি জানি, কি বুঝি ? যা পুরোনো লোকেরা বলে, একটু দেখেশুনে সই করে দি।"

"তবু একটু আধটু খোঁজ নিও। একেবারে গা আলগা দিও না।" আমি বলি।

জ্যোতি ঘরে প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল। তাহার রুক্ষ চেহারা, মলিন অবিন্যস্ত চুল, পাংশু মুখ দেখিয়া বুঝিলাম শোকের ঝড়ও তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সে বুঝিয়াছে আজ তাহাদের কত বড় বিপদ ! জ্যোতি আমার পাশে আসিয়া বসিল।

আমি জ্যোতির পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে, জ্যোতি ?"

জ্যোতি উত্তর দিল "মাষ্টার মশায় এসেছিলেন দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলুম্।"

"তুমি এবার কোন্ ক্লাশে উঠ্‌লে ?"

জ্যোতি বলিল "ক্লাশ নাইন্।"

আমি একটু অবাক হই, পরে বলি, "বাঃ তা হলে তো দু বছর বাদে ম্যাট্রিক দেবে।" আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলি, "মিনতিদি, একে বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে দাও, কিছু কাজ ওখান থেকে শিখে আসুক।"

মিনতিদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ওর ইচ্ছে হয় ও যাবে। তোমরা পাঁচজন ব্যবস্থা করে দেবে, আমি বাধা দেব কেন ?"

জ্যোতি কিন্তু যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। কহিল, "মাকে একলা রেখে আমি কোথাও কখনও যাব না।"

এত দুঃখেও মনে যেন কিছুটা তৃপ্তি পাইয়া মিনতিদির ওষ্ঠে এক ফালি হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমিও একটু হাসিলাম।

জ্যোতি আমাকে বলিল, "আপনার নতুন কি একটা বই বেরিয়েছে দেখলুম, আমাকে তো দেন নি? বাড়ি ফিরেই কিন্তু এক কপি পাঠিয়ে দেবেন।"

আমি বলি, "ও বই তোমার ভাল লাগবে না, প্রবন্ধের বই।"

জ্যোতি বলিল, "তা হলেও এক কপি পাঠিয়ে দেবেন। আপনার বই তো!"

আমি বলি, "আচ্ছা পাঠিয়ে দেব।"

জ্যোতি পুনরায় বলিল, "মেশমশায় আপনার কোন কবিতার বই বেরিয়েছে ?"

আমি বলি, "আমি কবিতা লিখি, তুমি জানলে কেমন করে ?"

জ্যোতি বলিল, "বাঃ মাসিক পত্রিকায় আপনার কবিতা পড়ি যে।"

জ্যোতির পড়িবার খুবই আগ্রহ। ছেলেমানুষ সে, তথাপি আউট্‌-বুক্‌স্‌ পড়ে। নিজের ছোট্ট একটি লাইব্রেরী ঘর করিয়াছে।

জ্যোতি বলিল, "মেশমশায় আমার লাইব্রেরী দেখবেন ? আপনি তো এখানে আসেনই না। আজকে যখন এসেছেন আমার লাইব্রেরী দেখতে হবে কিন্তু।"

ভালই হইল জ্যোতি আমাকে এইরূপ অনুরোধ করিল। সত্য কথা বলিতে কি, এই ঘরে আর এক মুহূর্তও মন টিঁকিতে ছিল না। মিনতিদির এই ধূলি-মলিন শোকাচ্ছন্ন প্রতিমূর্তি, ভাঙ্গা জাহাজের মত একটা অসহায় আর্ত ও বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে ক্রমশ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম।

তখনও ঘরে গুমোট, আবহাওয়া যেন তখনও শোকাবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল! মিনতিদির এক ফালি হাসি, করুণার অকস্মাৎ আগমন, বন্দুক ছোঁড়া ও শিকারের কথা, জ্যোতির প্রবেশ ও পড়াশুনা লইয়া কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কতা—এই সব যেন এক বিন্দু বুদ্‌বুদের মত উঠিয়া, এক বিন্দু রংয়ের আকাশ সৃষ্টি করিয়া, এক ফোঁটা লহরী ও কাকলি তুলিয়া পর মুহূর্তেই মিলাইয়া গেল। জাগিয়া রহিল শুধু মৃত্যু ও শোকের একটা নগ্ন বীভৎস বিভীষিকা!

অদূরে ছোট টেবিলটির উপরে রক্ষিত মিনতিদির স্বামীর ফটোখানি এই বিভীষিকাকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিল।

"মিনতিদি আজ আসি।"

"এসো" মিনতিদি তেমনি ক্ষীণকণ্ঠে জানাইল।

জ্যোতির হাত ধরিয়া তাহার পড়িবার ঘরে আসিলাম। দেখিলাম তিনটি আলমারী ভর্তি বই। জ্যোতি আলমারীগুলি খুলিল, বইগুলি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইতে লাগিল।

হঠাৎ দেওয়ালের দিকে নজর পড়িতে দেখিলাম জ্যোতির পিতার একটি ছোট ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে। একটি বেলফুলের মালা পরানো।

জ্যোতি আমাকে বলিল "এই ছবিটা পরশু করিয়ে এনেছি।"

আমি ছবিটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

অকস্মাৎ মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। ভিতর হইতে একটা উদাসীনতার ভাব আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কত কী যে মনে হইতে লাগিল সমস্ত আমি নিজেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

জ্যোতি বলিতে লাগিল, "রোজ একটা বেলফুলের মালা ও একটু চন্দন ছবিটাতে দিই। মেশমশায়, বাবাই তো ভগবান, না?"

আমি তখনও ছবিটির দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া আছি।

জ্যোতি বলিল, "বাবা মার চেয়ে ত বড় কেউ নেই জগতে। বাবা স্বর্গ থেকে সব দেখতে পাচ্ছেন আমি কি কচ্ছি না কচ্ছি। তাঁকে এই যে পূজো করি, তিনি ঠিক আমার পূজো পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি পড়াশুনা করে জীবনে খুব বড় হই। আমি পড়বো, নিশ্চয়ই জীবনে বড় হবো। নয় তো তিনি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবেন কেমন করে?"

আমার কানে জ্যোতির এই সমস্ত শিশু মনের প্রলাপ বাক্য প্রবেশ করিতে ছিল না। অতি দ্রুত আমার মনে কতকগুলি চিন্তা আসিয়া ভীড় করিয়া ছিল। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছোট ছবিটির

দিকে চাহিয়া কেবলই মনে হইতেছিল, মানুষ জীবিত কালে কত বড় এলাকা জুড়িয়া থাকে, আর মরিয়া গেলে তাহার স্থান জগতে কতটুকু—দেওয়ালের এই ছোট ছবি !!

মিনতিদির স্বামীর এই বিরাট চারমহলা বাড়ি, বাড়ির সম্মুখে এত বড় বিস্তীর্ণ উদ্যান, বহু মূল্যের আসবাব পত্রে সুসজ্জিত এত বড় বড় ঘর, এত বড় সংসার, এত দাস-দাসী, এত বড় ব্যবসা—বাঁচিয়া থাকিতে কত বড় পরিধি জুড়িয়া সে বাঁচিয়া ছিল! কিন্তু আজ তাহার স্থান জ্যোতির পড়িবার ঘরের নগণ্য দেওয়ালের উপরের সামান্য কয়েক ইঞ্চি জমি !!

আট দশ বছর পর এই জ্যোতি বড় হইবে। সে বিবাহ করিবে, তাহার সংসার হইবে। এই ঘর তখন অন্য কাজে লাগিবে; অন্য ভাবে সাজিয়া উঠিবে। হয়তো তখন এই দেওয়ালে এই ছবি থাকিবে না; আজিকার যেটুকু জমি সে জুড়িয়া আছে, তাহাও হয়তো সে হারাইবে। একরাশ ধূলা ময়লার সহিত কোনো একটি গুদাম ঘরের এক কোণে হয়তো পড়িয়া থাকবে, পোকায় কাটিবে!

জ্যোতি আমার কাছে আসিয়া বলিল, "মেশমশায়, আপনি অতো কি ভাবছেন?"

নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসি। সত্যই তো! কি ভাবিতেছিলাম? জ্যোতির দিকে চাহিয়া বলি, "কই তোমার সব বইগুলি দেখি, চল।"

জ্যোতি আমাকে একটি চেয়ার আগাইয়া দিল, আমি চেয়ারে বসিলাম। জ্যোতির বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। নানান্ রকমের পুস্তক—কোনটি কবিতার, কোনটি প্রবন্ধের, কোনটি গল্পের, কোনটি গবেষণার, ছোটদের বিজ্ঞান-মালা-সিরিজ সমস্তগুলি কিনিয়াছে।

দেখিলাম বইগুলি লাল নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া। বুঝিলাম জ্যোতি সমস্ত বইগুলি বেশ ভাল করিয়া পড়িয়াছে। বুঝুক বা নাই বুঝুক পড়িয়াছে ত! সে ছেলে মানুষ। তাহার আগ্রহটাই বড় কথা। মনে অপার আনন্দ পাইলাম।

জ্যোতির সহিত পড়াশুনা, পুস্তকাদি ও আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি লইয়া প্রায় এক ঘণ্টা নানা কথা কহিলাম। তাহার পিতার মৃত্যুর কথাও হইল। মৃত্যুর সম্বন্ধে তাহার শিশু-মনের আজব ধারণাগুলি শুনিলাম। কোন প্রতিবাদ করিলাম না।

তাহার বিশ্বাস ভাঙিয়া দিয়া কি হইবে? বিশ্বাস তাহার ভাঙিবে না। যে স্বপ্ন তাহার শিশু-চোখে ও শিশু-হৃদয়ে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাকেই সে আঁকড়াইয়া থাকিবে, তাহাকে লইয়াই তাহার পিতার চারি পাশে এক রঙ্গিন স্বপ্নময় সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিবে, তাহার পিতাকে আরও কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখিবে।

তবুও ইহা একদিন ভাঙিয়া যাইবে। সে-দিন আজিকার এই জ্যোতির মধ্যে আর এক জ্যোতি আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে, হাসিবে, খেলিবে, নীড় বাঁধিবে, তাহার বাপের এত বড় দুইটি ব্যবসা চালাইবে।

জ্যোতি বলিল, "মেশমশায়, আমি যদি না পড়ি বাবা কি শাস্তি পাবেন?"

আমি বলি, "কখনই না, তোমার বাবা সব দেখতে পাচ্ছেন স্বর্গ থেকে। তুমি খুব মন দিয়ে পড়বে। ভাবেবে ঐ ছবি থেকে তোমার বাবা তোমাকে দেখ্ছেন।"

জ্যোতি বলিল,—"তা জানি, এ জন্যে তো কিছু দোষ করে ফেললে বাবার এই ছবির সামনে এসে ক্ষমা চাই।"

আরও দু-একটা কথা কহিয়া উঠিয়া পাড়লাম। জ্যোতিও বইগুলি তুলিয়া আলমারীগুলি বন্ধ করিতে লাগিল।

অন্দর মহল হইতে বাহিরে আসিতেছি, জ্যোতি বলিল, "মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না?"

আমি বলি, "না, অনেক দেরি হয়ে গেল। অন্য আর একদিন এসে দেখা করবো। তুমি চলো আমাকে বাইরে দিয়ে আসবে।"

জ্যোতির হাত ধরিয়া ঘোরানো মার্বেলের সিড়ি দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম।

সামনে ফুলের বাগান, নানা রকমের ফুল ফুটিয়াছে। এই সব ফুলের চারা মিনতিদির স্বামী বহুব্যায়ে দেশ বিদেশ হইতে আনাইত। সমস্ত বাগানটি ও বাড়িটি দূর হইতে ছবির মত সুন্দর দেখায়।

জ্যোতি বলিল,—"আমি রোজ সকালে নিজের হাতে ফুল তুলে নিয়ে যাই বাবার জন্যে।"

নিকটস্থ একটি চন্দ্রমল্লিকা ও বেল ফুলের গাছ হইতে কিছু ফুল তুলিয়া পাতায় মুড়িয়া জ্যোতি আমার গাড়ীতে দিল। বলিল,— "মেশমশায়, আবার একদিন শীগ্‌গির আসবেন।"

গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি হাত ধরিয়া জ্যোতি বলিল,—"কবে আসবেন ঠিক বলে যান।"

আমি বলি—"আসছে সপ্তাহে বুধবারে আসবো।"

জ্যোতি আর কিছু না বলিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে ড্রাইভার ষ্টার্ট দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পিছনে আমার দিকে চাহিয়া জ্যোতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লোহার বড় গেটের সম্মুখে সোজা রাস্তা। রাস্তায় আসিয়াও

পিছন ফিরিয়া আমি মিনতিদির প্রকাণ্ড বাড়িটি দেখিতে লাগিলাম। ড্রাইভার কিছুদূর আসিয়া ডানদিকে মোড় লইতে বাড়িটি চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পৈতৃক

গীতা শেষে ভালোবাসিয়াছে। ইহা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভালোবাসিয়াছে আবার কাহাকে? তাহারই পাড়ার মতিলালকে। বয়স যাহার ছাব্বিশ। পড়াশুনার সহিত যাহার সম্পর্ক কাটিয়া গিয়াছে অনেকদিন এবং দিন রাত তাস খেলিয়া, আড্ডা মারিয়া ও সকালে বিকালে চা খাইয়া যাহার দিন কাটে।

গীতার পাশে বহু নব্য সুকুমার যুবক থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া যে শেষে গীতা প্রেমে পড়িল এই একটি অকালকুষ্মাণ্ডের, তাহার ইতিবৃত্ত শুনিলে বিশ্বাস করিতে আরও প্রবৃত্তি হয় না।

মতিলালের বাপের সহিত না কি গীতার পিতা কারবার করিয়াছিলেন চালের আড়তের। মতিলালের বাপের শেষাশেষি মাথার অসুখ হওয়ায় গীতার বাপ সমস্ত হিসাবের খাতাপত্তর পাল্টাইয়া মতিলালের বাপের নাম সই করাইয়া লইয়া সমস্ত বিষয় নিজের নামে করিয়া লইয়াছিলেন।

যেদিন গীতা তাহার বাপের এই জুয়াচুরীর কথা শুনিল, সেদিন না কি সারারাত সে ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার পিতা শেষে এমন নীচ জঘন্যভাবে সমস্ত কারবার হাত করিয়া লইয়া-

ছিলেন! ছিঃ ছিঃ ইঁহাকে তাহার পিতা বলিতে হইবে! মতিলালকে সেইদিনই নিজে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল সে।

মতিলাল অবাক হইয়া গিয়াছিল। কি অভাবিত ব্যাপার! গীতা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে! গীতা! যে গীতাকে দেখিবার জন্য দুইবেলা রাস্তার রোয়াকে সে বসিয়া থাকিত, যাহাকে দেখিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিত সকালে বিকালে চায়ের দোকানে, সেই গীতা! অভাবনীয়েরও একটা সীমা আছে তো!

মতিলাল সেদিন কম্পিত বুকে গিয়া হাজির হইয়াছিল গীতার বাড়ি।

গীতা পাশের ঘরেই ছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া ও মৃদু হাসিয়া একটি বেতের চেয়ার বসিতে আগাইয়া দিয়াছিল।

গীতা বলিয়াছিল;—"দেখুন, আপনার সংগে আলাপ পরিচয় নেই। কিন্তু তবু ডেকে পাঠাতে বাধ্য হলাম কোনো কারণে।"

উত্তর দিবে কি! মতিলাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। বাধ্য হইয়া ডাকিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল! কেন? বাধ্য হইবার কি এমন কারণ ঘটিয়াছে?

গীতা একটু স্থির থাকিয়া আবার বলিতে শুরু করিয়াছিল;— "জানেন নিশ্চয়, আমার বাবা ও আপনার বাবা উভয়ে মিলে মিশে আমাদের এই ব্যবসা খুলেছিলেন।"

মতিলাল তাহা জানিত। অন্তত তাহার পিতা মারা যাইবার সময়ে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন এই কথা। প্রথমত সে ত্মে ইহা বিশ্বাসই করে নাই। ভাবিয়াছিল বিকৃতমস্তিষ্ক পিতার বিকৃত উক্তি। কিন্তু তাহার পিতা বুঝি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহার মনোভাব। তাই বলিয়াছিলেন, 'দেখিস্ বাবা, যদি শাস্ত্র সত্য হয় আর ধর্ম থাকে তো জানতে পারবি এ ব্যাপার তুই একদিন না

একদিন।' এক এক করিয়া মনে পড়িয়াছিল মতিলালের সেদিনকার সমস্ত কথা।

গীতা আবার বলিয়াছিল ;—"সত্যি কথা বলতে কি, বাবার অপরাধের জন্তে যদি আমায় দোষী মনে করেন তো আমার ওপর অবিচার করবেন আপনি। সত্যি, আমি এর জন্ত খুবই অনুতপ্ত।"

মতিলাল মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্যন্ত পারে নাই গীতার দিকে। তাহার সেদিন কেবলই মনে পড়িতেছিল মৃত্যুশয্যায় শায়িত তাহার পিতার রুগ্ন দেহ, আর জলভরা দুটি চোখ, যাহার ভাষা নাই, কিন্তু কি প্রগাঢ় অন্তর্দাহ ছিল তাহার অন্তরালে। সেদিন সে বায়েকের জন্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিল ছুটিয়া যাইয়া ভাণ্ডসের বাড়ি এক ঘা মারিয়া শেষ করিয়া দেয় ঐ অর্থপিশাচটিকে। কিন্তু গীতার সামনে বসিয়া সেদিন তাহার মনে আসে নাই কোনো দুঃখ কোনো বিষাদ। কেবল মনে হইয়াছিল, এ ঘটনাগুলি মনে না উদয় হইলেই যেন ছিল ভালো।

গীতা বলিয়া গিয়াছিল ;—"যেদিন প্রথম শুনলাম, বাবা আপনাদের ওপর কি জঘন্ত আচরণ করেছেন, আর কার পয়সায় বসে আমরা সুখে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছি, আর আপনার বৃদ্ধা মা ও অবিবাহিতা দুটি ভগ্নি গ্রামে গিয়ে তিলে তিলে দগ্ধে মরছেন, সেদিন থেকে নিজের ওপর ঘৃণায় লজ্জায় ম'রে যাচ্ছি। ভগবান যদি সময় দেন তো আমি এর শাস্তি নিজে হাতে করে মাথায় পেতে নেব।"

মতিলাল আর যাহাই ভাবুক, এতটা ভাবিতে পারে নাই ; আর যাহাই আশা করুক, এতটা আশা করে নাই। শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া গিয়াছিল গীতার উপর। সত্যই গীতার আত্মসম্মানজ্ঞান ও নীতিবোধ জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে সে কি তাহার পিতার

এই কুকীর্তি লইয়া তাহার মতো পরিচয়হীন একজন লোকের কাছে অমন করিয়া বলিতে পারে! গীতা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব আঘাত পাইয়াছে।

কথাটাকে তাই চাপা দিবার জন্ত মতিলাল কহিল;—"ওসব পুরোনো কথা ভেবে আর মনকে অত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?"

গীতা ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়া জানাইয়াছিল;—"কি বলেন? ঠকানো পয়সা নিয়ে বাবুয়ানি করছি, এ জেনেও কি আপনি চুপ ক'রে থাকতে বলেন আমায়? কি ভাবেন আমায় আপনি?"

এ যে উল্টা চাপ! সে, ভালোই বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু গীতা যে তাহার এমন অর্থ করিয়া লইবে, তা সে ভাবিতে পারে নাই।

"আমি তো তা বলিনি। বললাম, দোষ যখন আপনার নয়, তখন আপশোষ করাও আপনার উচিত নয়।"

"কিন্তু দেখে নেবেন, বড়ো হয়ে বিষয় পেলে ঠিক অর্ধেক দিয়ে দেবো আপনায়। তখন কিন্তু আপত্তি করলে শুনবো না।"

হাসিয়া জানাইয়াছিল মতিলাল;—"বেশ তো, দিয়েই দেখবেন নি কি না?"

ব্যাস্ প্রথম দিন এই পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দিন আবার মতিলালের ডাক পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত সামান্ত ক্ষণের জন্ত। তাহার পর গীতার সহিত আর দেখা হইত না। শুধু কলেজে যাইবার সময় চায়ের দোকানে মতিলালকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিত গীতা।

মতিলালের বন্ধুরা ক্ষেপাইত তাহাকে। সে কিন্তু ক্ষেপিত না বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না, শুধু গম্ভীর হইয়া কাপের পর কাপ চা

পান করিয়া যাইত। মাঝে মাঝে যখন চায়েও আর তাহার নেশা হইত না, তখন একটি সিগারেট ধরাইয়া জোরে জোরে টানিতে থাকিত।

মাত্র এইটুকু ইতিহাস গীতার প্রেমে পড়ার।

ইহাতে আশ্চর্য হইবে না। আর কে? উচ্চশিক্ষিত কোনো মেয়ের মনোহরণ করিতে উদীয়মান তরুণদের যে পরিমাণ সাজসজ্জার বিলাস, যে পরিমাণ প্রসাধনের বিন্যাসে অনুলিপ্ত থাকিতে হয় সর্বদা, মতিলাল তাহার কণামাত্র চেষ্টা না করিয়াও কেমন করিয়া অধিকার করিয়া ফেলিল গীতার মত অত্যাধুনিক একটি তরুণীর অন্তর, মতিলালের বন্ধুরা তাহার কোনো যথাযথ কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি নয়টায় বাড়ি ফিরিয়া মতিলাল আজ দেখিল, তাহার দু-একজন বন্ধু বসিয়া আছে। সে আজ সিনেমা গিয়াছিল! ঠিক যায় নাই, গীতা তাহাকে একপ্রকার ধরিয়াই লইয়া গিয়াছিল।

মতিলাল গীতাকে পাশে লইয়া সিনেমা দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব সুখ অনুভব করিতেছিল, যাহার সন্ধান সে সকাল বিকাল আড্ডা মারিয়া ও কাপের পর কাপ চা খাইয়া কখনো পায় নাই। একটি তরুণীকে পাশে লইয়া অন্ধকারে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকাতেও যে এতো আনন্দ থাকিতে পারে, সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

চোখে বুঝি তখনো মতিলালের ঘোর লাগিয়াছিল। সে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিয়া জামাটা খুলিতে খুলিতে কহিল;—"কখন এলি সব?"

তারক জানাইল;—"অনেকক্ষণ। তা কোথায় যাওয়া হয়েছিল—শুনি।"

মতিলাল মাটির দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। বন্ধুরা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

নরেশ কহিল ;—"গেছলি কোথায় রে ?"

জীবন কহিল ;—"হাসছিস্ যে ? বল্।"

মতিলাল কি যে বলিল ঠিক বোঝা গেল না, তবে কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া আবার মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল আগের মতো।

শৈলেন কহিল ;—"কি রে ? বল্ কোথা গেছলি ?"

মতিলাল কহিল ;—"গীতার সংগে সিনেমায় গিয়েছিলাম।"

সিনেমায় ! গীতার সংগে !

জীবন শুধু ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিল।

মতিলাল কহিল ;—"হ্যাঁ রে, সত্যি ! এই ছাখ্‌না টিকিট আর দুপুরের চিঠি !"

মুহূর্তে সমস্ত ঘরে যেন বজ্রপতন হইল। সকল বন্ধুদের মুখ কালি হইয়া গেলো। তাহারা ভাবিয়াছিল মতিলাল কোথাও একলা ঘুরিয়া আসিয়াছে। তাহারাই পাঁচজনে মিলিয়া উহাকে নাচাইতেছে। কিন্তু সত্যই কি তাহা হইলে সিনেমায় গিয়াছিল সে গীতার সহিত ? তাহা হইলে কি সত্যই গীতা প্রেমে পড়িয়াছে মতিলালের ?

গল্প আর আজ তেমন জমিল না। তাছাড়া রাত্রিও হইয়াছিল। সকলে স্থির জানিয়া গেলো যে, গীতা সত্যই ভালোবাসিয়াছে মতিলালকে, আর মতিলালের বরাৎ ফিরিয়া গিয়াছে।

সত্যই বরাৎ ফিরিয়া গেলো মতিলালের। সকাল বিকাল আড্ডা দেওয়া ও চায়ের দোকানে বসিয়া চা খাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে। কাজেই অতিরিক্ত চা খাইয়া খাইয়া শরীরে যে পাক ধরিয়াছিল অকালে, দেহে যে শুষ্কতা ধরিয়াছিল অসময়ে, তাহা কাটিয়া যাইতে লাগিল। শরীর তাহার নধর ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকগুলি স্বভাবও তাহার আশ্চর্যভাবে পাল্টাইয়া গেলো এই সঙ্গে। অযথা অবান্তর কথা বলা সে ছাড়িয়া দিল। পথে ঘাটে পথচারী যুবতী দেখিলে আগে যতো প্রকার টিকাটিপ্পনি কাটিত, তাহাও ভুলিয়া গেলো।

আগে দিনে খাওয়ার পর ঘণ্টা দুয়েক ঘুমাইয়া লইয়া গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দিত সে। কিন্তু আজকাল দিনে ঘুমানো সে ছাড়িয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা দেওয়াও ত্যাগ করিয়াছে। দুপুরে খাওয়ার পর আজকাল তাহার জন্য দুটি বাঙলা পান আসে। গীতা পাঠাইয়া দেয়। গালে তাহা পুরিয়া সে আজকাল একটি বিদেশী নভেল খুলিয়া পড়ে। বিকালের দিকে স্নান সারিয়া গীতার বাড়ির দিকে আগাইয়া চলে।

আজ গীতার বাড়ির কাছাকাছি গলিতে আসিতেই তাহার নজরে পড়িল কাহার একটি গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে গীতার বাড়ির সম্মুখে। মস্ত লম্বা 'ষ্টুডিবেকার'।

গাড়িটি দেখিয়া সে একটু দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ভাবিতেছে আগাইবে কি আগাইবে না গীতার বাড়ির দিকে, হঠাৎ গীতার বাড়ির সম্মুখের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল স্যুটপরিহিত এক সুন্দর যুবাপুরুষ ও ড্রাইভারের আসনে খুব দ্রুত পায়ে আসিয়া বসিল ও ষ্টার্ট দিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া গাড়িখানি সবেগে হাঁকাইয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলো।

থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর মতিলাল গীতার বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে পা চালাইল।

যে-ঘরে গীতা তাহার জন্য অপেক্ষা করে প্রত্যহ, বাড়ি ঢুকিয়াই সে-ঘরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল গীতা সে-ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া

আছে। সমস্ত শরীরে তাহার অবসাদ। যেন সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছে না। কিসের ভারে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল মতিলাল ;—"কি হয়েছে গীতা ?"

গীতা চমকিয়া উঠিল, পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল ;— "এতো দেরী করলে ? তোমার জন্যই তো ভাবছি।"

"বেশী দেরী তো হয় নি। দশ মিনিট মোটে।"

"কি যে বলো! দশ মিনিট কি কম হলো? জানো রোজালিণ্ড কি বলেছিলো অরল্যাণ্ডোকে ? সে তো দেরী করেছিলো পাঁচ মিনিট। আর তুমি ?"

মতিলালকে গীতা বুঝাইল প্রেমশাস্ত্রে এক মিনিট হইতেছে এক যুগ, বিরহ হইতেছে বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষা আরো তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক, আর প্রিয় যে, তাহার রূপের কাছে পূর্ণিমার চন্দ্রও হার মানিয়া যায়।

মতিলালের মনে খুশির ঝড় উঠিল। সে সরিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ দুটী ব্যাগ্র বাহু মেলিয়া কাছে টানিয়া লইল গীতাকে। গীতা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করিল না।

কিছুক্ষণ পর গীতা ধীরে ধীরে কহিল ;—"ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।"

কেউ যে আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা তাহার মাথায় আসে নাই একেবারেই। ছাড়িয়া দিয়া তখুনি সে একটু সরিয়া বসিল।

গীতা কহিল ;—"দেখো আজ মাথাটা বড় ধরেছে, বেড়াতে যেতে আর পারবো না। কিছু মনে করো না।"

"না না।"

আরো কিছুক্ষণ বসিয়া চা খাইয়া ও গল্প করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল মতিলাল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মতিলাল গীতার বাড়ি পৌঁছিয়া শুনিল দুপুর হইতে গীতা বাড়ি নাই, পিকনিক করিতে গিয়াছে বন্ধুবান্ধবদের সহিত।

ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে এক টুকরা স্লিপে লিখিয়া রাখিয়া গেলো সে যে, সে আসিয়াছিল তাহার কথা মতো, কিন্তু গীতাই ছিলো না।

পথে নামিয়া সে কিছুদূর আসিয়াছে, পিছনে দুই তিনটি গাড়ির হর্ন শুনিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল গাড়ি হইতে গীতা নামিতেছে ও গাড়ির মধ্যে বসিয়া আছে এক রঙের শাড়ী ও স্যুট পরিহিত অনেক যুবতী ও যুবাপুরুষ।

মনে হইল তাহার যে, একবার গীতার সহিত দেখা করিয়া আসে। নিশ্চয়ই গীতা খুশি হইবে। কিন্তু সাহসে কুলাইল না তার। এই প্রথম গীতার বাড়ি যাইতে তাহার ভয় করিল।

সে আর দাঁড়াইল না। পিছনে আর না তাকাইয়া বাড়ির দিকে চলিতে লাগিল। বাড়ি ফিরিয়া জামা খুলিয়া ফেলিয়া বিছানায় গিয়া শুইল ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রি আর তাহার কিছু খাওয়া হইল না।

সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া মতিলাল দেখিল তাহার জ্বরভাব হইয়াছে। ক্ষুদ্র কাগজে দু-লাইন লিখিয়া জানাইয়া দিলো সে গীতাকে যে, আজ বিকালে সে যাইতে পারিবে না। যদি সে আসে তো খুব ভালো হয়। সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

প্রত্যুত্তরে জানাইল গীতা যে, কাল অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহারও শরীর ভালো নাই। জ্বরের মতো হইয়াছে। ডাক্তার বিকালের দিকে আসিবে। তবে ভাবনার কোনো কারণ নাই।

সারা সকাল না খাইয়া ও দুপুরে নিশ্চিন্ত আরামে ঘণ্টা তিনেক ঘুমাইয়া বিকালের দিকে মতিলাল প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিল। মাথার ব্যথা আর নাই; তবে সারাদিন ও আগের রাতে না খাওয়ার দরুণ একটু দুর্বল।

চকিতের মতো মনে পড়িল এক বার গীতার জ্বর হইয়াছে; বিকালে ডাক্তার আসিবে।

গীতার জ্বর! একবার দেখিয়া আসিবে নাকি? গীতা খুশিই হইবে। কিন্তু যদি রাগ করিয়া বলে যে, অসুস্থাবস্থায় আসার কি এমন প্রয়োজন ছিলো?

মনে মনে উত্তর ভাঁজিয়া ঠিক করিয়া রাখিল মতিলাল। প্রেমশাস্ত্র সম্বন্ধে সে এক নূতন ব্যাখ্যা শুনাইবে গীতাকে।

ভাবিতে ভাবিতে কখন যে মতিলাল গীতার বাড়ি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা খেয়াল নাই। হঠাৎ তাহার হুঁস হইল বাড়ির ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া।

কে গান করিতেছে? গীতা? গীতা গান করিতেছে? তাহার কি তবে অসুখ করে নাই? তাহা হইলে সে কি মিথ্যা লিখিয়াছে?

মতিলালের বুকে ঝড় উঠিল।

হঠাৎ গীতার গান থামিয়া গেলো। সঙ্গে সঙ্গে করতালি ও হর্ষোল্লাসের বর্ষণ শুরু হইল।

মতিলালের কাণে যেন কে বা কাহারা তপ্ত গলানো সীসা ঢালিয়া দিতে লাগিল।

প্রথমে কেমন যেন বিশ্বাস হইল না তাহার। নিজের শ্রবণশক্তি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে না তাহাই বা কে জানে? এ কথনই হইতে পারে না।

গীতা তাহাকে ভালবাসে, কথায় কথায় গায়ে ঢলিয়া পড়ে, হাতে হাত টানিয়া লয়। তাহার একটু কিছু হইলেই সে কতো চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া পড়ে। এই তো সেদিন এক সুন্দর যুবাপুরুষের সম্মুখ দিয়া বুক ফুলাইয়া তাহাকে লইয়া গীতা মোটরে করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল! আর যাহাই হউক, সে-সব ঘটনা তো আর মিথ্যা নহে।

কিন্তু ও কি! আবার করতালি ও নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি! হাঁা, সত্যই তো গীতার কণ্ঠস্বর! সত্যই তো গীতা হাসিতেছে!

মতিলাল সবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সে যাইবে ভিতরে, দেখিবে সত্যই গীতার জ্বর হইয়াছে কি না! গীতা তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে কি না!

যদি সত্যই গীতা ইহা করিয়া থাকে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকে, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে সকলকার সম্মুখেই, এমন করিয়া অযথা তাহাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্য কি? এমন করিয়া তাহার সহিত প্রেমিকার অভিনয় করিল সে কেন? কি অধিকার আছে তাহার মতিলালের আত্মসম্মানে ঘা দিবার? হইতে পারে সে দরিদ্র, আর সে সম্ভ্রান্ত, কিন্তু তাই বলিয়া এমনভাবে তাহার পৌরুষকে অপমান করিবার সাহস কে দিলো তাহাকে? তাহার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স কি? এত নীচ গীতা?

দ্বার খুলিয়া দুই পা ভিতরে যাইতেই যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। দেখিল, সম্মুখের বড় হল্ ঘরটিতে "ডান্‌স্" হইতেছে ও সেই সুন্দর যুবাপুরুষের সহিত গীতা 'বলডান্‌স্' করিতেছে।

কি সুন্দর সাজিয়াছে গীতা!! অপরূপ এক স্বর্গীয় লাবণ্যে তাহার

দেহের প্রতিটি কণা যেন মর্মরিত। অসুস্থতার লেশমাত্র কোথাও নাই।

মাথার মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিয়া আবার দপ্ করিয়া নিভিয়া গেলো। ধীর মন্থর পদে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পথে নামিয়া নিজের দুর্বল শরীরটিকে একটি গ্যাস-পোষ্টে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড় করাইয়া পরে মাঠের দিকে আগাইয়া চলিল। কানের কাছে গীতার বাড়ির বাদ্যঝংকার ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে আসিতে শেষে বাতাসে মিলাইয়া গেল।

মাঠের অন্ধকারে নির্জন একটি গাছতলায় বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল সে। তাহাকে যে মাঝখানে ডামির মত দাঁড় করাইয়া গীতা তাহার প্রণয়পথের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরাইয়া দিয়া নিজের প্রণয়ীকে আয়ত্তে আনিয়াছে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

কিন্তু হায়! আজকের দিনে ডামির মতোই স্থির অবিচল থাকিতে সে পারিতেছে না কেন? কেবলই চোখ ভরিয়া তাহার জল আসিতেছে কেন? সম্পত্তির বখ্রা মারিয়াছে যে বাপ, তাহার মেয়ে যে তাহার অন্তরের স্বস্তি ও শান্তিটুকু চুরি করিয়া লইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

তদন্তে

সন্ধ্যা থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে সত্যনারায়ণকে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ফরসা একখানা মিলের কাপড় ও সাদা টুইল পরে সামনের ফুটপাতে সে অনেকক্ষণ রয়েছে দাঁড়িয়ে।

গত রাতে তার বাড়িতে চুরি হ'য়ে গেছে—স্ত্রীর কখানা গহনা, সদ্য-প্রাপ্ত মাহিনার নোট ক-টা ও আনুসঙ্গিক আরো কিছু। সেই নিশুতি রাত্রেই সত্যনারায়ণ ও তার স্ত্রী দুজনে মিলে খুব খানিকটা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ শুরু ক'রে দেয়, কিন্তু কোন সুফল ফলে না। পরিশেষে পাড়া-প্রতিবাসীরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে। কাজেই, উপায়ান্তর না দেখে সত্যনারায়ণ থানায় এই দুর্ঘটনার ডাইরী করিয়ে আসে।

সকালেই আসবো ব'লে সকাল থেকে ক্রমে দুপুর, ও শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তবুও কোন ইন্স্‌পেক্টরের পদধূলি পড়ল না দেখে সত্যনারায়ণ একটু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়লো।

মনে তার অসংখ্য কথা অসংখ্য বুদবুদের মত উঠছিলো আর মিশিয়ে যাচ্ছিলো। সে আজ সর্বস্বান্ত! সামনের এই একটা মাস তার চলবে কি ক'রে? দেনা! দেনা তার অবশ্য নেই

কোথাও। কারণ অন্তরে অন্তরে সে ঋণকে ঘৃণা করতো। অসংখ্য আপদের মধ্যে পড়েও সে তাই কোন দিন ঋণ করেনি। কিন্তু আজ যে একবারে নিঃস্ব!

এই সব চিন্তায় সত্যনারায়ণের মন যখন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে হঠাৎ তার বাড়ির সামনে একটা 'ট্যাক্সি' এসে থামলো।

চিন্তার ধারা ছিন্ন হ'য়ে যায় তার। তার বাড়ির সামনে 'ট্যাক্সি'! কে নামছে? ইন্স্‌পেক্টর না? হ্যাঁ, তাই তো!

এক-মুহূর্তে তার ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ স্বচ্ছ হ'য়ে আসে।

সত্যনারায়ণ এগিয়ে এলো;—"এই যে, নমস্কার।"

ইন্স্‌পেক্টর 'ট্যাক্সি'র দরজা খুলে একটা পা পাদানীতে দিয়ে, নিজের পাইপ্‌টা মুখে লাগিয়ে বললেন;—"নমস্কার!" পরে মাটিতে নেমে;—"একটু দেরী হয়ে গেল, অনেক কাজ ছিলো।"

ব্যথিত কণ্ঠে সত্যনারায়ণ বললো;—"সকাল থেকে অপেক্ষা ক'রে ক'রে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আর এলেন না।"

"কী যে বলেন! আস্‌বো না মানে?" ইন্স্‌পেক্টর তার পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন;—"আমাদের ত এই কাজ। এরই জন্যে তো গাদা গাদা মাইনে দিয়ে কোম্পানী আমাদের রেখেছে। বাঃ আস্‌বো না কি রকম?"

"যাক যখন এসেই গেছেন, তখন তো সে সব নালিশ চুকে গেছে," হেসে সত্যনারায়ণ বললো;—"এখন চলুন, দরিদ্রের বাড়িতে।"

ভেজানো দ্বার খুলে ইন্স্‌পেক্টরকে নিয়ে সত্যনারায়ণ ভেতরে এলো। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট বাল্‌ব্‌টির শীর্ণ পরিপাণ্ডুর আলো জেলে ও হাতলভাঙা চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে সত্যনারায়ণ বললো;—"একটু রেষ্ট নেবেন তো! না, এখুনি ঘরটা একবার একজ্যামিন্ করবেন?"

"দাঁড়ান মশায়! কোম্পানীর চাকর ব'লে কি আমরা ভেবেছেন মেসিন্, মানুষ নয়? সকাল থেকে খেটে খেটে যে নাজেহাল্ হয়ে গেলাম!" ইন্স্পেক্টর নিজের মোটা কোট্ খুলে ফেললেন, সেই সংগে নিজের হ্যাট্টাও।

"তা সত্যি, আপনাদের—"

"উঃ! বড্ড গরম!" সার্টের বোতামগুলো ইন্স্পেক্টর খুলে দিলেন।

"ইলেকট্রিক্ ফ্যান তো নেই, পাখা এনে দোবো?" সত্যনারায়ণের স্বরে কুণ্ঠা।

"না, না তার দরকার হবে না, তবে" একটু হেসে ইন্স্পেক্টর বললেন;—"এক কাপ চা হবে?"

সত্যনারায়ণ হেসে ফেললো;—"এক কাপ কেন আপনি কুড়ি কাপ খান্ না! দাঁড়ান তা হলে ও ঘর থেকে একটু ঘুরে আসি।"

খানিকক্ষণ পর সত্যনারায়ণ ও-ঘর থেকে ঘুরে এলে ইন্স্পেক্টর বললেন;—"সেই সংগে আমি চার আনা পয়সা দিচ্ছি কাউকে দিয়ে মিষ্টি আর কিছু খাবার কিনে—"

"না, না," সত্যনারায়ণ বাধা দিয়ে বললো,—"আমার বাড়িতে আমার উপকারে এসে নিজে খাবার কিনে খাবেন, তা কখনো হয়? আমি এখুনি আস্ছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।"

"বেশ, বেশ সানন্দে আমি অপেক্ষা করছি।" ইন্স্পেক্টরের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সত্যনারায়ণ বেরিয়ে গেলো রাস্তার দিকের দরজা খুলে। পথে নেমেই সে দেখলো 'ট্যাক্সি' তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্যনারায়ণকে দেখে 'ট্যাক্সি'-ড্রাইভার 'ট্যাক্সি'র দরজা খুলে নেমে এগিয়ে এলো

তার কাছে। সত্যনারায়ণ থেমে গেলো চলতে চলতে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

ড্রাইভার জানালো ;—"বাবু ভাড়াটা দিয়ে দিন, চলে যাই কতোক্ষণ আর দাঁড়াবো ?"

সত্যনারায়ণ প্রথমটা যেন ঠিক করতে পারলো না। পরে জিজ্ঞাসা করলো ;—"কত ভাড়া ?"

"সাড়ে বারো টাকা।"

সত্যনারায়ণের কণ্ঠ বিস্ময়ের সপ্তকে উঠে গেল ;—"সাড়ে বারো টাকা ! উঃ ! বলো কি ?"—একটু থেমে ;—"তা অতো হল কি করে ? থানা থেকে হেঁটে আসতে লাগে আধ ঘণ্টা আর মটরে বড়ো জোর মিনিট দশ।"

"আজ্ঞে, তা জানি।" ড্রাইভার অনুনয়ের সুরে বলতে লাগলো ;—"উনি তো আর সোজা থানা থেকে এখানে আসেন নি। ময়দানে দু তিন চক্কোর ঘুরলেন, নেমে খানিকটা বেড়ালেন তারপর এলেন আপনার এখানে।"

সত্যনারায়ণ স্তম্ভিত।

"তা বাবু, আট আনা বেশি ভাড়া তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাড়লো।" উনি ফিরবার সময়ে বললেন 'যে বাবুর বাড়ি যাচ্ছি তিনিই ভাড়া দিয়ে দেবেন'। আমি ভাবলাম ইন্‌স্পেক্টর-বাবুকে পৌঁছে দিয়েই আপনি আমার ভাড়া চুকিয়ে দিতে আসবেন। তা আপনি তো এলেন না, আমি কি করি বলুন ?" ড্রাইভার মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সত্যনারায়ণের স্বচ্ছ আকাশ আবার ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। একেই তো সে সর্বস্বান্ত, তার ওপর আবার এতোগুলো টাকা

ইন্‌স্পেক্টরের ট্যাক্‌সি-ভাড়া! ভেবে দেখলে সে, এই ভাড়ার কথা নিয়ে ইন্‌সপেক্টরকে কিছু বলাও যায় না! হয়তো ইন্‌সপেক্টর তাহলে তেমন 'ইন্‌টারেষ্ট' নেবে না তার এ-তদন্তে! একদিকে অতোগুলো টাকা, গহনা, আর এদিকে মাত্র এই কয়েকটি টাকা। অগত্যা সত্যনারায়ণ ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে দিলো। পরিচিত সামনের একটি মুদীর দোকানে সে ধার করলো কিছু টাকা।

খাবারের ছোট্ট একটি ঠোঙা হাতে করে ঘরে ফিরে এলো সত্যনারায়ণ। জোর করে মুখে হাসি এনে বললো ;—"ট্যাক্‌সি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো বলেন নি!"

"ওহো! বাই জোভ্‌! একদম ভুলে গেছি আপনাকে বলতে। সামান্য কিছু বেশি পড়লো হয়তো, তা ডোন্‌ট্‌ মাইণ্ড, ও রকম একটু-আধটু বাজে খরচা হয়েই থাকে।"

ভদ্রতার খাতিরে সত্যনারায়ণকে বলতে হলো;—"হ্যাঁ, তা এ রকম মাঝে মাঝে বাজে খরচা সংসারে হয়েই থাকে।"

খাবারের ঠোঙা থেকে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে একটা কামড় দিয়ে ইন্স্‌পেক্টর বললেন ;—"আপনাদের এখানকার সিঙাড়া তো খুব টেষ্ট্‌ফুল! আমাদের পাড়ার চাইতে লক্ষগুণে ভালো! শালারা এক একটা পজিটিভ নুইসেন্স!"

সত্যনারায়ণ হেসে বললো ;—"তাই না কি?"

ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে অস্পষ্ট শব্দ করে ইন্‌সপেক্টর বললেন ;—"আর বলেন কেন মশায়? জ্বালাতন! কোথায় যে সারাদিন পর বাড়ি গিয়ে একটু তৃপ্তি ক'রে বাজারের খাবার খাবো, তার যো নেই। শালাদের ফাইন করলেও শিক্ষা হয় না। দু-তিন দিন বেশ হলো, ব্যাস্ তারপর আবার 'পুনর্মূষিকো ভব'।"

তারপর শুরু হলো কলকাতার কোন কোন দোকানের সিঙাড়া খুব মুখরোচক। কবে কোন এক অখ্যাত গলিতে ননী বাহারের দোকানে বসে তিনি দশ টাকার সিঙাড়া খেয়েছিলেন। ননী বাহার অখ্যাত হলেও সে পাড়ায় তার পসার ছিলো বেশ। শুধু সিঙাড়াই সে ভালো তৈরী করতে পারতো; কচুরি, নিমকী প্রভৃতি সব "চলনসই।" ননী বাহার আজ চার পাঁচ বছর হলো কলেরায় মারা গেছে! ব্যাস্, সেই থেকে তাঁর সেই উৎকৃষ্ট সিঙাড়া-ভক্ষণের স্বাদ অসম্পূর্ণ ই রয়ে গেছে। তবে এ সিঙাড়াগুলিও ভালো, অনেকটা সেই ননী বাহারের সিঙাড়ার মত!

ইন্‌স্‌পেক্টরকে খুশি করার জন্যে সত্যনারায়ণ বললো;—"আরো কিছু সিঙাড়া কিনে আনবো না কি?"

ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বললেন;—"সকাল থেকে কাজের ঠেলায় তাতেই খাওয়া হয় নি। আর বলবেন না মশায়, কি ঝকমারি যে করেছি এই চাকরি নিয়ে, তা আর কহতব্য নয়! দিন নেই রাত নেই খালি টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে হয় এখানে সেখানে, কি গ্রীষ্ম, কি শীত! কোনদিন বেঘোরেই প্রাণ হারাবো দেখবেন!"

সত্যনারায়ণ মনে মনে এবার অস্বস্তি অনুভব করছিলো। সে-ভাব চেপে সে বললো;—"তাহলে কিছু বেশি সিঙাড়া কিনে আনি। কি বলেন?"

"আচ্ছা, যখন বলছেন অতো ক'রে, তখন নিয়ে আসুন আরো কিছু।" ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে ফেললেন।

ভারী পায়ে সত্যনারায়ণ আবার রাস্তায় নেমে পড়লো। আরো কিছু সিঙাড়া কিনে ফিরে এলো।

—"খালি সিঙাড়াই আনলেন? শুধু মুখে কি এত সিঙাড়া খাওয়া যায়?"

সত্যনারায়ণ বলতে বাধ্য হয় ;—"আরো কিছু আনবো নাকি ?"

—"না না তেমন কিছুই না। এই গোটাকয়েক কচুরি আর কিছু মিষ্টি।" ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বললেন ;—"আমি একটু বেশি খাই কি না।"

আবার উঠে গিয়ে সত্যনারায়ণ কিছু কচুরি আর মিষ্টি কিনে আনলো।

তারপর এ-কথা সে-কথার মধ্যে দিয়ে সত্যনারায়ণ তার চুরির তদন্তের কথা যেই তুললো, ইন্‌স্‌পেক্টর একগাল হেসে বললেন ;—"আচ্ছা, শুনেছি না কি এখানকার জিলিপি খুব প্রসিদ্ধ! বহুদিন খাই নি। সেই যে আমার ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তারপর থেকে একেবারেই না। আমার ছোটমেয়ে যে কি চমৎকার, সুস্বাদু জিলিপি তৈরী করতো মশায়, তা আর আপনাকে কি বলবো!"

ইন্‌স্‌পেক্টর শুরু করলেন, তারপর তার ছোট মেয়ের নাম ছিলো শীতলা। পুরাকালীন নাম হলেও তা আধুনিকও বটে। জিলাপী প্রস্তুতে 'ন্যাক্' ছিলো তার ছোট থেকেই। কোন এক বন্ধুর মায়ের কাছ থেকে সে শিখে আসে। তখন সে খুব ছোট। তারপর নিজের মাথা ঘামিয়ে, দিনের পর দিন খেটে সে জিলাপী তৈরীতে এমন সুদক্ষা হয়ে উঠেছিলো যে বাজারের ব্যবসায়ীদের পর্যন্ত তাক্ লেগে যেতো। যে একবার সে-জিলাপী খেয়েছে তার আর কখনো বাজারের জিলাপীতে স্বাদ মিটবে না, মিটতে পারে না!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সত্যনারায়ণকে যোগ দিতে হয় ;—"খুব আশ্চর্য তো! তাহলে আপনার জামাতা খুব ভাগ্যবান বলতে হবে!"

ইন্‌স্‌পেক্টরের উচ্চ হাসিতে দেয়ালের ভেতরকার ইঁটগুলো যেন নড়ে উঠলো। তিনি বললেন ;—"তা আর বলতে মশায় ? মেয়ে দেখতে এলো জামাই নিজে, দিলুম দু'খানা মেয়ের তৈরী জিলিপি খাইয়ে। ব্যাস্!

আর যাবে কোথা! মেয়ে আর দেখলেই না। একেবারে দিন স্থির করতে বলে চ'লে গেলো।"

সত্যনারায়ণ প্রগাঢ় অন্তর্দাহ টিপে উত্তরে শুধু মুচ্‌কে একটু হাসলো।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলতে লাগলেন ;—"যদি পাই অপারচুনিটি কোনদিন তো আপনায় নিশ্চয় খাওয়াবো তার জিলিপি।"

কচুরি ও মিষ্টি প্রায় নিঃশেষ হলো দেখে সত্যনারায়ণ বললো ;—"একটু সবুর করুন আপনার জিলিপি কিনে আনি।"

সত্যনারায়ণ উঠলো আবার।

"শুনুন।" ইন্‌স্‌পেক্টর ডাকলেন।

সত্যনারায়ণ দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললো ;—"কি? আরো কিছু আনবো?"

"না, না আবার কি? আপনি আমায় শেষে মারবেন না কি? আর কতো খাবো?"

"তেমন কিছুই তো খেলেন না", সত্যনারায়ণের কণ্ঠে চাপা বিদ্রূপ ;—"আরো সিঙাড়া, কচুরি, মিষ্টি নিয়ে আসি। কি বলেন?"

"আপনি তো বেশ লোক মশায়? তদন্তে ডেকে এনে শেষে খাইয়ে মারবেন? না, না, আমি আর খাবো না, আপনি যাই বলুন। তবে যদি আরো সের-খানেক জিলিপী আনেন তো খাওয়া যেতে পারে, তাও জোর ক'রে আপনার খাতিরে।"

সত্যনারায়ণ অন্তরে অন্তরে জ্বলতে থাকলেও হেঁসে প্রস্থান করছিলো, ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন ;—"হ্যাঁ, দেখুন যে জন্তে ডেকেছিলাম আপনাকে। এক টিন গোল্ড ফ্লেক কিনে আনবেন তো। বহুদিন হলো গোল্ড

ব্রেক্ ছেড়েছি ; কিন্তু আজ খাওয়াটা যা জোর হ'য়ে গেলো, গোল্ড ফ্লেক্ না খেলে হজমই হবে না।"

মন্ত্রচালিতের মত দ্রুত পা চালিয়ে সত্যনারায়ণ বেরিয়ে গেলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে আবার ফিরে এলো ঘরে।

কপটভাবে হেসে সত্যনারায়ণ বললো ;—"আপনার জন্যে একটা নতুন খাবার এনেছি। বর্ধমানের সীতাভোগ বিক্রি হচ্ছিলো দোকানে। মনে হলো নিয়ে যাই আপনার জন্যে। আধসের এনেছি। যদি কম হয় তো বলুন আরো—"

"আঃ, আপনি জ্বালালেন দেখছি। কত খাবো বলুন তো !"

"খান, খান খেয়ে ফেলুন, আধ সের, তিন পো তো আপনার দাঁতের ফাঁকেই আটকে যাবে।"

অনুরোধের এতো কড়া তাগিদের জন্য কি এখনো ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ইন্স্‌পেক্টর সেই বাড়তি ক-খানা জিলাপী ও আধসের বর্ধমানের সীতাভোগ গলাধঃকরণ করলেন তা জানা গেলো না। গেলাসের জলে হাত ধুয়ে সন্তক্রীত সিগারেটের টিন্ থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন।

"উঃ ! আজ একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেলো।" প্যাণ্টের নাভির বোতামটা ইন্স্‌পেক্টর খুলে দিলেন।

"আরো পো খানেক বর্ধমানের সীতাভোগ এনে দেবো ?" সত্য-নারায়ণের চোখে-মুখে পরিহাস।

"এবার খেলে আমায় তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্তে আপনার লোকের বন্দোবস্ত করতে হবে।" ইন্স্‌পেক্টর চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

"আমার ঘরটা একবার দয়া করে দেখবেন, না আরো খানিকক্ষণ জিরিয়ে দেখতে যাবেন ?" সত্যনারায়ণের কণ্ঠে অনুনয়।

"যা খাওয়ালেন এতে সারারাত ঝিরিয়ে তবে কোন কাজ করার উৎসাহ আসে!" প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন ;—"ওঃ! সো টায়ার্ড!" একটু হেসে ;—"চোখ যে ঘুমে ঢুলে আসছে মশাই, ঘর একজ্যামিন্‌ করবো কি?"

দুচোখ কপালে তুলে সত্যনারায়ণ আবেদন জানালো ;—"তাহলে কি আজ আমার ঘরটা—"

"মাফ্‌ করুন মশায়। পেটে এতো মুগুর ঠাসার পর আবার মেণ্টাল স্ট্রেন! তাহলে নিশ্চয় হার্টফেল করে মারা পড়বো।" ম্লান হেসে ইন্‌স্‌পেক্টর জানালেন—"আমার হার্ট বড় উইক মশায়! খাওয়ার পর এব্‌সলিউট্‌ রেষ্ট্‌ দরকার, কোনো নারভাস স্ট্রেন একদম মানা। তা'ছাড়া জানেন তো 'ওয়ান আওয়ার্স মেণ্টাল লেবার ইজ ইকোয়াল টু থ্রি আওয়ার্স ফিজিক্যাল লেবার!' সব জেনেও কি আপনি আমায় মেণ্টাল লেবার করতে বলেন?"

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সত্যনারায়ণের দুচোখে ;—"তা হলে, তা হলে—"

ইন্‌স্‌পেক্টর বিষম এক ঢেঁকুর তুলে বললেন ;—"ওরে বাবা! একেবারে চোঁয়া ঢেঁকুর যে! সেরেছে! গিয়েই জোলাপ খেতে হবে।"

মর্মাহত, আশাহত সত্যনারায়ণ স্পন্দহীন চোখে চেয়ে রইলো।

"আজ চলি মশায়, কাল সকালে অবশ্য অবশ্য আসবো।" ইন্‌স্‌পেক্টর কোট গায়ে দিলেন "আপনি কিছু ভাববেন না।"

হ্যাট্‌টা মাথায় দিয়ে দরজার কাছে এসে বললেন ;—"আর একটা সিগারেট দিন তো!"

নিষ্প্রাণ সত্যনারায়ণ সিগারেটের টিন্‌টা হাতে এগিয়ে দিলো। ইন্‌স্‌পেক্টর একটা সিগারেট বের ক'রে ধরিয়ে টিন্‌টা নিজের পকেটেই

রেখে দিলেন;—"যদি কাল আসতে দেরি দেখেন তো ফোন্ করবেন একবার।"

ফোন্ নম্বর দিয়ে ইন্স্‌পেক্টর 'গুড্‌নাইট' বলে নেমে পড়লেন রাস্তায়।

শীর্ণ, পেলব তরুর মত নিঃস্ব সত্যনারায়ণ দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক হয়ে।

পরদিন বেলা বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও যখন ইন্স্‌পেক্টরের আসবার কোন নিদর্শন পাওয়া গেলো না, তখন নিকটস্থ কোন দোকান থেকে সত্যনারায়ণ ফোন্ তুলে নিলো। উত্তর এলো যে গতরাত্তেই তিনি চলে গেছেন কোন দূর অঞ্চলে। "কবে ফিরতে পারেন?" জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এলো "সে বিষয় নিশ্চিৎ করে কিছু বলা কঠিন।"

বিশীর্ণ হেসে সত্যনারায়ণ ফোন্ রেখে দিলো।

মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন ফোন্ করে সত্যনারায়ণ জানলো যে ইন্স্‌পেক্টর ফিরেছেন। খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে আধ ঘণ্টার পথ সে অতিক্রম করলো পনর মিনিটে। প্রায় দৌড়েই সে এলো সারা পথ।

থানায় পৌছেই সে জিজ্ঞাসা করলো ইন্স্‌পেক্টর সেনের কামরা কোন দিকে। একজন আর্দালী সুপরিচিত পোশাকে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে দেখিয়ে দিলো।

সত্যনারায়ণ সোজা সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ইন্স্‌পেক্টর তখন মাথা নিচু ক'রে কাগজপত্র দেখছেন।

ঘরে পায়ের শব্দে তিনি মাথা তুলে বললেন;—"কে? একেবারে ঘরের ভেতর চলে এসেছেন যে! কে আপনি? হু আর ইউ? আর্দালী! আর্দালী!" সঙ্গে সঙ্গে ইন্স্‌পেক্টর হাতের কাছে ঘণ্টা মুহুর্মুহুঃ টিপতে লাগলেন।

আর্দালী সামনের পর্দা সরিয়ে ঘরে এলো মুহূর্তে। সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

সত্যনারায়ণকে দেখিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন; "বেঁকুব কাঁহাকা! তোম্ লোক কেইসে কাম্ করতা হ্যায়? ঘরমে আদমি লোক চলা আতা।" ইন্‌স্‌পেক্টরের চক্ষু রক্তবর্ণ।

"বাবুজী!" জোড় হাতে আর্দালী সত্যনারায়ণকে দেখিয়ে বললো;— "এ বাবু তো হামসে বোলা 'হাম্ বাবুকে দোস্ত'।"

"কোন তুম্‌কো বোলা এ বাবু হাম্‌কো দোস্ত হ্যায়?" ইন্‌স্‌পেক্টর আর্দালীর দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন;— "যো কোই তুম্‌কো বোলেগা হাম্ বাবুকে দোস্ত হায়, আওর তোম্ ছোড় দেগা?"

শত-সহস্র মিনতি ক'রে আর্দালী বললো;—"সম্‌ঝিয়ে বাবু থোড়েসে—"

"হাম্ কুছ্ নেহি শুন্‌নে মাঙতা" ইন্‌স্‌পেক্টর জমিদারী-কণ্ঠে বললেন; —"জান-পৈছান নেহি, এ বাবুকো তোম্ কাহে ছোড়া? বোলো আগাড়ি। হাম্‌কো হুকুম লিয়া থা?"

"নেহি বাবু" ভয়ে আর্দালীর কণ্ঠ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।

"তব্" ইন্‌স্‌পেক্টর চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন;—"তব্ কাহে ছোড়া হায়? সোয়াইন! উল্লু কাঁহাকা! এইসে তুম্ কাম করেগা?"

"আচ্ছা সাব্, কসুর তো হোগিয়া, মাফি দে দিজিয়ে।" আর্দালীর কণ্ঠ ভয়ে কাঁপা,—"হুজুর তো মেরে মা বাপ্।"

ইন্‌স্‌পেক্টর চুপ করে রইলেন, কিন্তু তবুও যে তিনি শান্ত হন নি তা বিলক্ষণ বোঝা যায়।

আর্দালী আবার বললো ;—"মাফি দে দিজিয়ে সাব, আউর কভি নেহি কাম্‌মে গল্‌তি হোগা।"

টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজের দিকে চেয়ে ইন্স্‌পেক্টর বললেন,—"আচ্ছা যাও, ঠিক্‌সে কাম্‌ করনা !"

"বহোৎ আচ্ছা জনাব।" ইন্স্‌পেক্টরকে সেলাম ক'রে সত্যনারায়ণের দিকে চেয়ে আর্দালী বললো ; "শালে !"

সত্যনারায়ণের চোখের সামনে এতক্ষণ যেন ভোজবাজি হচ্ছিলো। হঠাৎ আর্দালীর এরূপ সম্বোধনে তার অবলুপ্ত চেতনা পুনরুদ্ধারিত হলো। সে কাতর, করুণ কণ্ঠে বললো ;—"চিনতে পারছেন না আমায় ? আমি সত্যনারায়ণ, আমি—"

"আরে চুপ্‌, মারকে হাড্ডি তোড়্‌ ডালেগা অভি।" সাঁড়াশীর মত আর্দালীর একখানি হাত সত্যনারায়ণের ঘাড়ে চেপে বসলো।

অসহায় সত্যনারায়ণ মরিয়া হয়ে আরেকবার শেষ চেষ্টা করলো ;—"ইন্স্‌পেক্টর বাবু, আমি সত্যনারা—"

"আরে ভেড়ী কাঁহাকা ! ফিন্‌ চিল্লাতা হায় ?" সত্যনারায়ণের ঘাড়ে আর্দালীর আঙুল আর একটু জোরে টিপে বসলো।

সত্যনারায়ণ অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে দরজার বাইরে মিলিয়ে গেল।

ইন্স্‌পেক্টরের ধ্যান তবুও ভাঙলো না। তিনি তখনো গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর ফাইলের কাগজ-পত্র দেখছেন।